কলেজের মেয়ে

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটের একটি তেতালা বাড়ীতে ঘরে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যা তখন সবে সাতটা। বাড়ীখানি নানা ধরণের ছাত্রদের মেস। মেডিকেল কলেজের ছাত্রই বেশী। তেতালার দক্ষিণদিকের সারিতে তিনটি ঘর। এই ঘর কয়েকখানির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং বেশ পরিপাটি করিয়া সাজান, সেই ঘরে খাটের উপর বসিয়া চার-পাঁচটি যুবক কি কথা লইয়া যেন আলোচনা করিতেছিল, তাহাদের সকলেরই বয়স বাইশ হইতে পঁচিশের মধ্যে।

অতুল বলিল, 'সুধীর তুই কবে ছুটি নিচ্ছিস? শুনলাম এই অগ্রহায়ণের পঁচিশে তোর বিয়ে!'

'তাই নাকি?' বন্ধুদের মুখে কৌতুক হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

'একথা মোটেই জানতাম না—' অজয় পকেট হইতে সিগারেটের কেস বাহির করিল—'ভাগ্যে অতুল ফাঁস করে দিল! তুই কি বলে এত বড় একটা ব্যাপারে চুপ ক'রে রয়েছিস। আমরা না তোর বন্ধু?'

সুধীর দেখিতে পাতলা ছিপছিপে চেহারার, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম এবং মুখশ্রীতে কমনীয়তা এবং সৌকুমার্য্যের একটা আভা রহিয়াছে। সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বলিল, 'বলি নি, তার কারণ

.বিয়েতে হৈচৈ করা আমার মতে বর্ব্বরতা। ওটা নির্জ্জনের জিনিস অন্তত আমি তাই মনে করি।'

প্রফুল্ল বলিল, 'বিয়ের গভীরতম এবং গোপনতম অংশটা নির্জ্জনে সাধনার বস্তু, সে সম্বন্ধে সবাই একমত। চিরকাল ধরে কত যুগের কত কবি এই নির্জন অংশের কাব্য ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু বিয়ের আর একটা দিক আছে—যেখানে আলো জ্বলে, শানাই বাজে বন্ধুরা হল্লা করে—'

সুধীর উঠিয়া পড়িয়া কহিল, 'তোমরাও যথাসময়ে হল্লা করবে, ময়রা ভিয়েন বসবে, আমিও মাথায় টোপর পরব, কিন্তু আমি সে কথা ভাবছি নে, ভাবছি অন্য কথা।'

বন্ধুরা ঠাট্টা করিয়া কহিল, 'এখন কত কথাই ভাববে। কত কি মনে হবে। মনটা উড়বে কাব্যলোকে। কিন্তু হঠাৎ উঠে পড়লি যে কোথায় চলেছিস ?'

সুধীর বলিল, 'আমি যাচ্ছি বালীগঞ্জে যে নতুন সঙ্গীত সঙ্ঘের উদ্বোধন হচ্ছে সেখানে। নিমন্ত্রণ রয়েছে হয় ত গান করতে হবে।'

'তোর নিমন্ত্রণ থাকবেই, গুণী মানুষ! আচ্ছা, আমাদের একেবারে বাদ দিস নে তোর রোমান্স থেকে।'

সুধীর একাকী বাহির হইয়া গেল। সে মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, আর একবছর পরে ডাক্তার হইয়া বাহির হইবে। লেখাপড়ায় বিশেষ ভাল, মড়া কাটিতেও যেমন ওস্তাদ, সাঁতার কাটিতে, গান গাহিতে, সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগে—সকল দিকেই তাহার সমান কৃতিত্ব। সাধারণ উচ্চশিক্ষিত উদার মন বাঙালীর মত তাহার অন্তঃপ্রকৃতির এবং বাহিরের মুখশ্রীর একটি কমনীয় লাবণ্য আছে।

বালীগঞ্জের গানের সভাতে অনেক গণ্যমান্য লোকজন রহিয়াছেন, উচ্চাঙ্গের অনেক কথাবার্ত্তা আলোচনা হইল। আমাদের জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব যে কত ব্যাপক—এমনই ধরণের বহু আলোচনা কর্ণগোচর হইল। সভা ভাঙিবার পরে যখন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মেসে আসিয়া সে পৌছিল তখন ন'টা বাজিয়া গেছে।

শুক্লপক্ষের একটুখানি জ্যোৎস্না তেতালার ছাদের এ দিকটায় আসিয়া পড়িয়াছে। সুধীর সিঙ্গল সীটেড্ রুমে থাকে। নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তাহার চেয়ারে বসিয়া একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে এক মনে কি একটা বই পড়িতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র সুধীরের মন আনন্দে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

'আরে নির্ম্মলেন্দু, কখন এসেছ ?'

ছেলেটি একটু সলজ্জভাবে একটা নমস্কার করিয়া বলিল, 'এসেছি অনেকক্ষণ। এসে শুনলাম আপনি বেরিয়ে গেছেন। তাই অপেক্ষা ক'রে ব'সে রয়েছি।'

এইখানে ছেলেটির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। যে মেয়েটির সঙ্গে সুধীরের বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হইয়াছে, নির্ম্মলেন্দু তাহার ভাই। দুজনে পিঠাপিঠি। এক বৎসরের মাত্র বয়সের ব্যবধান। সেই জন্য সুমিত্রা কিছুতেই নির্ম্মলেন্দুকে দাদা বলিয়া ডাকে না। নির্ম্মলেন্দু একথা সেকথা করিয়া নানা গল্প জুড়িয়া দিল।

'আচ্ছা, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'বালীগঞ্জে সঙ্গীত সঙ্ঘের উদ্বোধন হচ্ছে, সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল।'

নির্ম্মলেন্দু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর কহিল, 'আচ্ছা, গান ক'রে বা গানের চর্চ্চা ক'রে এখন আমাদের দেশের কি উপকার হবে বলতে পারেন ? বিবেকানন্দের সেই কথাটা আপনার

মনে আছে? "এখন আমাদের চাই শিরায় শিরায় প্রবাহিত রক্তোচ্ছ্বাস"।'

সুধীর হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, 'মনে আছে কি না ঠিক মনে নেই, কিন্তু তোমার বোন কি বলেন? তাঁরও মত এই নাকি?'

নির্মলেন্দু অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া চুপ করিয়া গেল। হঠাৎ বলিল, 'আচ্ছা, আপনার পায়ের মাপটা একবার দিন না।'

'ও বুঝেছি, তত্ত্বের জিনিসপত্রের সঙ্গে জুতা কিনবে বুঝি?' সুধীরের মুখে সকৌতুক হাসি।

তার পরে ষ্টোভ ধরাইয়া চা তৈরী করিয়া নির্মলেন্দুকে পান করাইয়া সে যখন তাহাকে বিদায় দিতে নীচে নামিয়া আসিল, তখন তাহার মনে ঈষৎ সুমিষ্ট একটুখানি কৌতুকের সুর জাগ্রত হইয়াছিল। তরুণ মনের অগাধ আশা আকাঙ্ক্ষা, অপরিসীম আদর্শবাদ, তাহারই সহিত আসিয়া মিশিল নূতন একটি আনন্দের সুর। যাহার সহিত তাহার জীবন মিলিত হইতে যাইতেছে, না জানি সে কেমন, কেমন তাহার মনের সুর, কি তাহার মতামত, কোন্ পথে তাহার চিন্তার ধারা চলে!

২

টালিগঞ্জ রোডের উপর একখানি সুদৃশ্য বাড়ীর সামনে বেথুন কলেজের বাস আসিয়া দাঁড়াইল। সতের বছরের একটা তন্বী সুশ্রী মেয়ে খাতা-পত্র হাতে নামিয়া টক টক্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিল।

নীচের ঘর হইতে বৃদ্ধা পিসীমা ডাকিয়া বলিলেন, 'কে রে, সুমিত্রা বুঝি? না বাপু, সবই তোদের বাড়াবাড়ি। দশ দিন পরে মেয়ের বিয়ে হবে, আর আজও কলেজ যাচ্ছিস!'

সুমিত্রা মায়ের সামনে পড়িতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'সুমিত্রা, পিসীমার কথা শুনলি? তিনি যা বলছেন তা সত্যি। আর তোর কলেজ যাওয়া ভাল দেখায় না।'

সুমিত্রা একটুখানি ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল, 'পিসীমা অমনি বলেই থাকেন; সেকেলে বুড়ি! তাই বলে ওঁর মতেই চলতে হবে না কি। তুমি আমার বিয়ের আগে কলেজ যেতে বারণ করছ, আজকাল কত মেয়ে বিয়ের পরেও কলেজ যাচ্ছে।'

মা আর কিছু বলিলেন না, বা বলিতে সাহস করিলেন না। কারণ তিনি পল্লীগ্রামের মেয়ে; আশৈশবের শিক্ষা সংস্কার লইয়া কলিকাতার আধুনিক স্বামীগৃহে অহরহ হাবুডাবু খাইতেছেন। কোনখান অবধি যে আধুনিকতার সীমা রেখা তাহা তিনি আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই কোন্ কথা বলিলে যে তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে তাহা না বুঝিতে পারিয়া সাবধানে কথা বলেন। যেখানে বুঝিতে পারেন না চুপ করিয়া থাকেন।

সুমিত্রার বাবা ভুবনবাবু একজন নামজাদা প্রফেসর। সাধারণ শিক্ষিত উন্নতিশীল বাঙালী পরিবারের মত মেয়েকে কলেজে পড়িতেও দিয়াছেন, আবার সতের-আঠার বছরের হইতে না-হইতে বিবাহের জন্যও খোঁজাখুঁজি করিতেছেন। সুধীরকে পাত্র হিসাবে তিনি মন্দ মনে করেন না। ছেলেটি দেখিতে ভাল, স্বাস্থ্যবান, ডাক্তারী পড়ে। পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী। বাড়ীর অবস্থাও ভাল। কন্যার পাত্র হিসাবে তাঁহাকে তাঁহার বেশ পছন্দ হইয়াছে। মেয়ে কলেজে পড়িলেও এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হইলেও মেয়ের বাপ ঠিকুজী আদি মিলাইয়াছেন এবং বর-কন্যার জন্মপত্রিকার উত্তম যোটক হইয়াছে—জ্যোতিষীর মুখে এবম্বিধ সংবাদ পাইয়া আশ্বস্ত হইয়া বরের পিতাকে চিঠি দিয়াছেন।

কিন্তু এ ত গেল পূর্বকথা।

উপস্থিত সুমিত্রা কলেজের বই এবং খাতা কয়েকটা ছুঁড়িয়া তাহার টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। গুন গুন করিয়া গানের একটা লাইন গাহিতে গাহিতে সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিতে লাগিল। চুল বাঁধা শেষ হইলে তোয়ালেখানা কাঁধে ফেলিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিল। বাথরুমে প্রসাধনের নানা সরঞ্জাম সজ্জিত। সামনে কলতলায় প্রকাণ্ড একটি স্নানের টব রহিয়াছে। দেয়ালের গায় বড় আয়না টাঙান। আয়নার পাশে একটি কাঠের কারুকার্য করা ব্র্যাকেটে চিরুনি, সাবান ইত্যাদি সরঞ্জাম রক্ষিত। কাপড় ছাড়িয়া স্নান সারিয়া সুমিত্রা যখন বাহির হইয়া আসিল তখন সূর্য অস্ত যাইবার আর বড় বিলম্ব নাই।

ঘরে ঢুকিতেই ঝি খবর দিল, 'দিদিমণি, তোমার কলেজের বন্ধুরা সব আসতে লেগেছে। তোমার বসবার ঘরে তাদের বসিয়ে রেখেছি। তারা সবাই তোমাকে খুঁজছে। বলছে, আজ তোমার এত দেরী কেন?'

সুমিত্রা ত্বরিত পদে তাহার বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল বিকাল বেলায় ব্যাডমিন্টন খেলিবার সমস্ত সঙ্গীরা একে একে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'আজ আমার একটু দেরি হয়ে গেছে ভাই। কলেজ থেকে এসেই পিসীমার পাল্লায় পড়লাম। তাঁকে ঠাণ্ডা করতে না করতে মা তর্ক জুড়লেন—'

ইরা প্রশ্ন করিল, 'তর্কটা কিসের?'

'কেন, তাও আবার জিজ্ঞেস করতে হয় না কি? ওঁদের সেই মান্ধাতার আমলের তর্ক—বিয়ের বয়স হয়েছে, বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে, আবার কলেজে যাওয়া কেন? ওঁদের সঙ্গে তর্ক করা মানে সময় নষ্ট। তাই সে চেষ্টা ছেড়েছি। তবুও সময় খানিকটা নষ্ট হ'ল।'

ধীরা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'অমনই হয়। এক যুগের আদর্শ আর এক যুগকে বোঝানো যায় না। তুমি হাজার মাথা-মুড় খুঁড়লেও বোঝাতে পারবে না।'

অমলা বলিল, 'থাক গে ওসব কথা। চল আমরা ছাদে যাই। আজ বোধ হয় আর ব্যাডমিণ্টন খেলা হবে না। আলো কমে এসেছে।'

ছাদে আসিয়া অমলা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, 'আহা কি চমৎকার সূর্য্যাস্ত হচ্ছে!'

ইরা বলিল, 'আর ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে সমস্ত আকাশে যেন কে আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে।'

সরসী ভাববিমুগ্ধ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

'দিবস যদি সাঙ্গ হ'ল, না যদি গাহে পাখী
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে—
এবার তবে গভীর ক'রে ফেল' গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে।'

সুমিত্রা কহিল, 'রবি ঠাকুরের ঐ সব অতিরিক্ত ভাবে গদগদ কবিতা বেশী পড়লে মাথা ঠিক থাকে না।'

দীপা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'এখন তোর মাথা ঠিক না থাকলেও চলবে। এই ত ডিসেম্বরের শেষে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, বড় দুঃখ হচ্ছে এই মনে করে যে এত পড়লি, থার্ডইয়ার অবধি পড়েও বি-এ পরীক্ষাটা দিতে পেলি নে।

'কেন, পরীক্ষা দেব না কেন? একথা তোকে কে বললে?' সুমিত্রা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিল।

'না, বলে নি কেউ। আমি এমনিই বলছি। বিয়ের পরেও আর ক'টা মেয়ে কলেজে পড়ে পরীক্ষা দিতে পায়?'

'আমি পাব।'

'এরই মধ্যে তোর হবু-বরের মত নেওয়া হয়ে গেছে নাকি?' ইরা মুখ টিপিয়া হাসিল।

'তা এক রকম হয়েছে।' সুমিত্রা আরক্ত মুখে কোন মতে বলিয়া ফেলিল।

'বাঃ, তা হ'লে ত বেশ, তোর শ্বশুরবাড়ী বেশ আধুনিক তা হ'লে, নয়?'

'বাবা তাই বলছিলেন। তার বেশি কিছু জানি নে।' সুমিত্রা তাহার অত্যগ্র আধুনিকতা সত্ত্বেও কথাটা বলিবার সময় লজ্জায় মুখখানি একটু নত করিল।

তাহাদের গল্পালাপে বাধা পড়িল। ঝি আসিয়া বলিল, 'ছাদে হিম পড়ছে, মা তোমাদের আর ছাদে থাকতে বারণ করলেন।'

নীচে নামিয়া আসিতে সুমিত্রার মা তাহাদের বলিলেন, 'ওমা, তোমরা আজ একটু জল খেয়ে যাও। এ সমস্তই বাড়ীর তৈরী খাবার।'

ধীরা [illegible]র স্বরে বলিল, 'মাসীমার হাতে একবার পড়লে কিছু না খেয়ে যাবার যো নেই। এ যেন আপনার বাড়াবাড়ি।'

'বাড়াবাড়ি নয় মা। এই ত আর দু'দিন পরে সুমিত্রার বিয়ে হ'য়ে যাবে তখন কি আর তোমরা এমন ক'রে যখন তখন আসবে, না,' আমিই তোমাদের দেখতে পাব?'

ধীরা বলিল, 'আচ্ছা মাসীমা, এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিচ্ছেন কেন? সুমির এমনই কি বয়স, আমার চেয়েও হয় ত বছর খানেকের ছোট।'

সুমিত্রার মা বলিলেন, 'ভাল ঘর পেয়ে গেলাম। ভাল ছেলে। তারা কি আমাদের কথা মত সবুর করবে মা? আর যতই বল, ভাল ঘর-বর পেলে মেয়ের বিয়ে দিতে কোন বাপ-মা দেরী করে? কলেজে-

পড়া, 'ডিগ্রী নেওয়া, লেখাপড়া শেখা—এ সবই ত অপেক্ষার পালা। যত দিন না ভাল পাওয়া যায়, তত দিন কি করবে? এই ভেবেই না। আমি ত এই বুঝি।'

ধীরা আর কোন কথা বলিল না, মীরাও না। সুমিত্রাও চুপ করিয়া রহিল। তরুণী মনের বিরাট একটা আদর্শবাদ—কত স্বপ্ন, কত ভাঙাগড়া, সে সমস্ত যেন সুমিত্রার মায়ের গৃহজনোচিত এই কথায় ধা খাইল।

বন্ধুরা চলিয়া যাইবার পরে ধূমমলিন কলিকাতার সন্ধ্যার দিকে সুমিত্রা চাহিয়া ছিল, আধুনিকতার সমস্ত তর্কের উত্তাপ সত্ত্বেও তাহার মনের গভীরতম প্রান্তদেশ দিয়া একটি সুমধুর সুর বহিয়া যাইতেছিল। আস্তে আস্তে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিল, রাজপথের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিল। রাস্তার বিচিত্র জন-প্রবাহের সুর, ট্রামের শব্দ, বাসের আওয়াজ, এ সকল অত্যন্ত সাধারণ শব্দ এবং দৃশ্যের মাঝখানে বসিয়াও তাহার সমস্তই নূতন লাগিতে লাগিল।

৩

পূর্ববঙ্গের একটি ছোট শহরে সুধীরদের বাড়ীতে উৎসবের আনন্দ সুরু হইয়াছে।

'ওমা, আর সময় নেই, রাত্রি বারোটা বাজে এখনও যে আমার আল্পনার কিছুই হ'ল না।' একটি হাস্যমুখী তরুণী আলিপনা আঁকিতেছিল, তাহার চারিদিক্ ঘিরিয়া মেয়ের দল। কেহ বা গল্প করিতেছে, কেহ নিজের গয়নার প্যাটার্নের কথা সবিস্তারে বলিতেছে, কেহ বা নূতন-বৌ কেমন হইবে তাহারই বিষয়ে অতিমাত্রায় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে।

সুধীরের বোন কাদম্বিনী হাসিমুখে বলিল, 'বৌদি ত আই-এ পাশ করেছে। লেখাপড়া জানা মেয়ে, খুব শিক্ষিতা। দেখতেও বেশ সুন্দরী। তা ভাই, তোমাদের অত কৌতূহল কেন? কাল সকালে যখন বৌ আনবে তখন স্বচক্ষেই সমস্ত দেখতে পাবে।'

মেয়ের দল তত খুশী হইতে পারিল না।

একজন বলিল, 'গেরস্ত ঘরে আই-এ, বি-এ পাশ করবার কি দরকার? আমাদের ভাই অত নেই, পাঁচপাঁচি হলেই হ'ল। এই ত গেল বছর আমার দাদার বিয়ে হ'ল, বৌদি মোটে দ্বিতীয় ভাগ আর আখ্যানমঞ্জরী অবধি পড়েছিল, তাতেই—'

কাদম্বিনীর মুখ গম্ভীর হইল। সে বলিল, 'ভাল মেয়ে যারা তারা লেখাপড়া শিখেও ভাল হয়, না শিখেও হয়। তবে লেখাপড়া জানা থাকলে কতকগুলা সুবিধে হয় বই কি। সংসারে নিতান্ত অসহায় আর অন্ধের মত দিন কাটাতে হয় না।'

তরলা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, 'ওটা কথার কথা। নইলে কতকগুলা আঁক কষতে শিখলে আর ইতিহাস ভূগোলের সাল তারিখ নাম মুখস্থ করলেই বুঝি সংসার সম্বন্ধে চরম জ্ঞান হয়? দাদা আর বাবা বলেন—'

কাদম্বিনীর বিশেষ সখী মাধবী তাহার পাশে বসিয়াছিল। সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিল কাদম্বিনীর মনের অবস্থাটা। একে ত তাহারই দাদার বিবাহে যে তাহার বৌদি হইবেন, তিনি কলেজে পড়া উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে তাঁহার উপর তাহাকে ঠেস দিয়া যেমন প্রখর আলোচনার ধারা বহিতেছিল, তাহাতে কাদম্বিনীর মনে আঘাত লাগিবারই কথা। সে তাড়াতাড়ি কথা ফিরাইবার উদ্দেশ্যে বলিল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে, এখনও আল্পনার অনেক কাজ বাকী। নে নে,

কাজ করে নে কাদম্বিনী। কেবল গল্প করলেই কি সব কাজ আপনা থেকে হয়ে যাবে?'

ইঙ্গিতটুকু বুঝিতে কাদম্বিনীর দেরী হইল না। সেও এই অজুহাতে গল্প-আলোচনার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া হাতের কাজের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিতা মহিলারা একে একে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা আত্মীয়া কুটুম্বিনী তাঁহারাও বিশ্রামার্থে নিজের ঘরে শয়ন করিতে গেলেন। নববধূর বরণের সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করিয়া কাদম্বিনী যখন মুখ-হাত ধুইয়া তাহার শয়ন-কক্ষের সংলগ্ন বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আকাশে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না। বৃহৎ কর্ম্মবাড়ী নিঃশব্দ। রাত্রির স্তব্ধ প্রশান্তির মাঝে ক্ষণকালের জন্য একলা দাঁড়াইয়া কাদম্বিনীর মনে সংশয় দেখা দিতে লাগিল, যে মেয়েটি কাল প্রভাতে বধূ হইয়া এ বাটিতে পা দিবে, না জানি সে কেমন, কি রকম তাহার মনের ভাব। এই যে পাড়ার মেয়েরা অহোরাত্র সমালোচনা করিতেছে কলেজের মেয়ের স্বরূপ লইয়া—সর্ব্বদাই নানা ছলে তাহার মনে একটা বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছে, ইহার মূলে কোন সত্য আছে না কি?

কাদম্বিনীর এ ভাবনার একটু কারণ ছিল। তাহার আজ প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর যাবৎ বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বিবাহের পর একবার মাসখানেকের জন্য শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ছাড়া সে বরাবরই তাহার পিতৃগৃহে আছে। শ্বশুরবাড়ী তাহার বাঙলা দেশের একটি ছোট পল্লীগ্রামে। সেখানে ম্যালেরিয়া আছে, মশা আছে এবং পাড়াগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা শহরের মেয়ের পক্ষে ঠিক মনোরম বলিয়া বোধ হয় না। তা ছাড়া কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা অতি সামান্য ছিল।

কিছু জমি-জমা এবং একতলা দালানের সহিত মেসানো খানকয়েক কাঁচা মেটে ঘর। এ সকল জানিয়া শুনিয়াও কেবলমাত্র ছেলেটি দেখিয়া কাদম্বিনীর পিতা ব্রজনাথবাবু মেয়ে দিয়াছিলেন। তাঁহার মনে সঙ্কল্প ছিল, জামাইকে আইন পাশ করাইয়া নিজের কাছে প্র্যাক্‌টিসের জন্য বসাইবেন। সেজন্য কাদম্বিনী পিতৃগৃহেই থাকিত। সুখে-দুঃখে জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল এতদিন। মেয়ে বারোমাস বাপের বাড়ীতে থাকিলে কদাচিৎ এক আধবার আসিবার সমারোহ ও অভ্যর্থনা পায় না, তথাপি অশান্তি বা সংঘর্ষ বাধিবারও কোন কারণ ঘটে নাই। বাড়ীতে ভাই বোনের মধ্যে এক দাদা সুধীর, সে কলিকাতায় থাকিত, মেডিকেল কলেজে পড়িত। যখন ছুটি-ছাটায় বাড়ী আসিত, ছোট-বোনের হাতের যত্ন ও সেবাটুকু মিষ্ট লাগিত। বিশেষ করিয়া তাহাদের গৃহস্থালিতে মা ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক না থাকাতে এবং তিনিও বাতে একপ্রকার শয্যাশায়ী থাকাতে কাদম্বিনীই একরূপ এ বাড়ীর গৃহিণী ছিল। তাহার আর দুইজন দিদির খুব দূরে দূরে বিবাহ হইয়াছে। একজনের স্বামী এলাহাবাদে চাকুরী করিতেন, অপর জনের স্বামী সিমলার লাট-দপ্তরের কেরাণী ছিলেন। তাঁহারা কালে ভদ্রে কখনও বাপের বাড়ী আসিতেন।

কিন্তু এখন সংসারের চেহারা হইতে চলিয়াছে অন্যরূপ। সুধীরের যে বৌ আসিবে, ন্যায়তঃ সে-ই হইবে এ সংসারের গৃহিণী। তা হউক, তাহার জন্য কাদম্বিনীর মনে কোনরূপ ভাবান্তর নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনে একটা ভয় উঁকি মারিতেছে, কলেজের মেয়ে! না জানি সে কেমনতর। হয় ত তাহাদের চেয়ে ঢের উন্নততর শ্রেণীর জীব।

. ঢুক্ ঢুক্ বক্ষ-স্পন্দনের মাঝে বর-কনের মোটরখানা বিপুল বাজোদ্যমের সহিত বাড়ীর গেটে ঢুকিল। সুমিত্রার মুখের অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া কাদম্বিনী দেখিল, ভয় পাইবার কিছুই নাই। কোমল সুন্দর একখানি মুখ। পথশ্রমে ঈষৎ ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছে।

নূতন-বৌকে বিবাহের পরেই কয়েকদিন শ্বশুরালয়ে আড়ষ্ট হইয়া সঙ্কোচের মধ্যে কাটাইতে হয়। তাহার মধ্যে কষ্ট হয় ত আছে, কিন্তু এ বিধান সকলকেই মানিয়া লইতে হয়। রাত্রিবেলায় একা সুধীরের সঙ্গে সুমিত্রার কত কথা, কত আলাপই না হইয়া গিয়াছে। শেলী এবং বায়রণের কবিতা হইতে সুরু করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা এবং সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য ও অধ্যাত্মিকতা—কত বড় বড় আদর্শবাদের কথায় দু'জনে বিভোর হইয়াছিল। সুধীর মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছিল, আমার কপাল ভাল, নয় ত একটা বোধোদয় বা ফার্ষ্ট বুক পড়া অনঙ্গমোহিনী কিংবা নীলাম্বরণীর স্বামীটি হইয়া চিরকাল একটি সচল পুঁটুলি বহন করিতে হইত, তাহার বদলে এমন শিক্ষিতা সপ্রতিভ স্ত্রী পাইয়াছি। আর সুমিত্রা ভাবিতেছিল, যাই হোক, এর সঙ্গে কথা বলিয়া সুখ আছে। ডাক্তারি পড়েন বলিয়া মড়া কাটিয়া আর ওষুধের নাম মুখস্থ করিয়া একেবারে নীরস বনিয়া যান নাই।

কিন্তু সে ত গেল রাত্রির কল্পলোকের কথা। দিবসে সে কল্পলোকের মায়া অন্তর্হিত হইয়া গেল কোথায় এবং কোনদিক দিয়া, বিস্মিতা সুমিত্রা তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। কাদম্বিনী একরাশি তেল জবজবে করিয়া পমেটম দিয়া ঠাসিয়া পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া দিল।

সারা বাড়ীতে আত্মীয়া-কুটুম্বিনী নিমন্ত্রিতা মিলিয়া সর্ব্বদাই একটা সোরগোল চলিতেছে এবং তাহার নায়িকা নববধূ সুমিত্রা।

পমেটম দিয়া পাতা-কাটা অবগুণ্ঠনবতী সুমিত্রা আসিয়া বড় হলঘরের মধ্যখানে বসিল। যদিও সে নিজে পথ চলিতে পারে এবং দিব্য চক্ষুষ্মান, তথাপি ননদ তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই ঘরটায় আনিয়া বসাইয়া দিলেন। ঘরের মধ্যে কত রকমের কত মেয়ে বসিয়া বিরাট এক জটলা পাকাইয়াছিল, তুমুল কলরব উঠিয়াছিল।

সহসা সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। কেবল একটা চাপা হাসি, একটা ফিস ফিস চাপা আওয়াজ। অবগুণ্ঠনে প্রায় সমস্ত মুখ ঢাকা। তবুও, সুমিত্রা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, সে বুঝিতে পারিল, এতক্ষণ যাহারা তাহারই বিষয়ে তারস্বরে আলোচনা করিতেছিল, তাহারা চাপা হাসির মধ্য দিয়া সেই কাজই করিতেছে, কেবলমাত্র তাহার উপস্থিতির জন্য মৃদুস্বরে। নূতন জায়গায় নূতন আবেষ্টনের মাঝে আসিয়া একেই তাহার মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, তাহার উপর এই দৃশ্যে সমস্ত মন জ্বলিয়া উঠিল।

একটি মেয়ে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া গা ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল, 'আপনি নিশ্চয় গান জানেন, একটা গান করুন না। করবেন?'

'তোমরা গান বুঝতে পার?' সুমিত্রা রুক্ষস্বরে কহিল।

অনুরোধকারিণী মেয়েটির মুখ কালো হইয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘরের অন্যপ্রান্তে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া উত্তেজিত স্বরে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

কাদম্বিনী এক সময়ে কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিল, 'ছি, ও কি বৌদি, তুমি নতুন-বৌ, তোমার কি এখন অমনি করে বলা সাজে? গেরস্থ ঘরের বৌ-ঝিতে আর কে কোথায় গান গায় বল?

তবে নতুন বিয়ের-কনের কোন দোষ নেই। এ সময়েই যা সাধ লোকে মিটিয়ে নেয়। দাদার পাঁচটি বন্ধু এই সময় দেখতে চাইবে, গান শুনতে চাইবে। পরে ত আর পারে না। যদি গান কর তবে এই সময়েই করে নাও।'

সুমিত্রার মনটা জ্বলিতে লাগিল। কাদম্বিনীর কথার ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, সে যেন গান করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে ভিতরে ভিতরে। এই সুযোগে একবার নিজেকে জাহির করিয়া লউক, পরে ত আর সে সুবিধা আসিবে না!

ইহার জন্য কি সে আশৈশব কত যত্নে গান শিখিয়াছিল! যাহা সাধনার বস্তু, যাহা সৌন্দর্য্যের জিনিস, যাহা অনেক দিন ধরিয়া বহু যত্নে সে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাকেই জীবনের মধ্যে এই একটি বার মাত্র নূতন-বৌয়ের দোহাই দিয়া সে গায়িয়া চর্চ্চা করিতে পারিবে; তৎপরে আর নয়। উদ্ধতভাবে সে ননদের মুখের উপর বলিল, 'থাক, গান করবার জন্যে আমি ঠিক মরে যাচ্ছি নে।'

কাদম্বিনী ক্ষণকাল অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

ভিতরের দিকের একটা ঘরে সুধীর বসিয়াছিল, সে ডাকিল, 'কাদু, শোন্।'

'কি বলছ?'

এই, তোর বৌদিকে একটু সকাল সকাল ছুটি দে না। সেই কাপড় আর গয়নার রাশ গায়ে চড়িয়ে আর কতক্ষণ বেচারাকে সবারই কাছে পরীক্ষা দিতে হবে? যথেষ্ট হয়েছে।'

যদিও ভিতরে ভিতরে কাদম্বিনীর মন জ্বলিয়া যাইতেছিল, মুখে সে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, 'এরই মধ্যে এত ব্যস্ত হলে চলবে কেন দাদা!

আজ যে পরীক্ষারই দিন গো। সবাই আসবে, সবাই দেখতে চাইবে। যাকে তুমি 'না' বলে ফেরাবে, সে-ই নিন্দা করবে।'

'মুস্কিল! তা হ'লে এখনও বেচারাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে, বল্?'

সুধীরের হাস্যোজ্জ্বল মুখে আলো আসিয়া পড়িয়াছে। একটা গভীর আনন্দের আভায় তাহার সমস্ত মুখ দীপ্ত। সেই দিকে চাহিয়া কাদম্বিনী মৃদুস্বরে বলিল, 'দাদা, একটা কথা বলি, শুনবে?'

'শুনব না কেন?'

'বৌদিকে শিখিয়ে দিও মেয়েমানুষকে আরও একটু সহিষ্ণু আর নত হতে হয়। অত দাম্ভিক হলে চলে না।'

'কেন, কি হয়েছিল?' সুধীর ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

কাদম্বিনী সমস্ত ব্যাপারটা বলিবার পর সুধীর হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, 'কেন ও ত ঠিকই বলেছিল। তোদের ঐ সব মেয়ের দল যারা গান শোনবার জন্যে জেদাজেদি করছে, অথচ গান আরম্ভ হবামাত্র দেখবি ওরা তারস্বরে আলোচনা লাগিয়েছে—ও দিদি, তোমার ঐ অনন্ত জোড়া ক' ভরির? আমার টেঁপির অমনই পরশু রাত্রে হঠাৎ জ্বর—যা দিন কাল পড়েছে, সর্ব্বদাই ভাবনায় মরি—এমনই করে সবাই হট্টগোল করবে। আর গান থামলেই বলবে, আহা তোমার গলাটি সুন্দর, আহা! আর একটি গান গাও। কেন, তুই কি এসব জানিস নে নাকি?'

কাদম্বিনী ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, 'তুমি এমন করে প্রশ্রয় দিলে বৌদি আরও মাথায় চড়বে, দেখে নিও। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

সুধীর গম্ভীরস্বরে কহিল, 'বেশ ত আর দু'দিন যাক না কাদু। তারপরে প্রাণ ভরে তোর বৌদির দোষগুণের সমালোচনা করবি। এই ত সবে মাত্র কাল এসেছে।'

কাদম্বিনী চোখের জল কোনক্রমে চাপিয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বড় বারান্দাটা পার হইয়া আসিবার সময় দেখিল, স্বামী কি একটা কাজে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই দিকে আসিতেছে। থামিয়া গম্ভীর সুরে জিজ্ঞাসা করিল, 'রাতদিন তোমার ওসব হচ্ছে কি?'

কাদম্বিনীর স্বামী যতীন বলিল, 'বাঃ রে, রাতদিন কি! আজ কত কাজ দেখছ না? একটা না একটা কাজ লেগেই রয়েছে, ধর, এখন যেসব মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে, তাদের খাওয়ান হয় নাই। খাওয়াতে হবে, একে একে গাড়ীর বন্দোবস্ত করে পাঠাতে হবে। তারপরেও যে ত খুঁটিনাটি আরও কত কাজ বাকী থেকে যাকে।'

'যতই কাজ বাকী থাক, তোমার এত কি দায় পড়েছে?'

যতীন একটু অবাক হইয়া স্ত্রীর পানে চাহিল। এমন ধরণের কথা স্ত্রীর মুখে কখনও শোনে নাই। বলিল, 'ব্যাপার কি? তোমার কানের যে জড়োয়া এয়ারিং স্যাকরাবাড়ী থেকে এসেছে, সেটা তোমার পছন্দ হয় নি বুঝি?'

কাদম্বিনী তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, 'রসিকতা করবার আর সময় পাও নি নাকি?'

যতীন হতভম্ব হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। স্ত্রীর মেজাজের কোন কূলকিনারা সে করিতে পারিল না আজিও। ইহার পর সমস্ত কাজেই একটা না একটা ছল খুঁজিয়া কাদম্বিনী নিজেও যথেষ্ট রাগ রোষ করিতে লাগিল, অপরকেও উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

কে একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া নূতন-বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শাশুড়ী যে মা তোমার বাতে একরকম শয্যাশায়ী, যাও মা, তাঁকে নমস্কার করে এস গে।'

কাদম্বিনী গম্ভীর মুখে সুমিত্রার হাত ধরিয়া তাহার মায়ের শয়ন ঘরের অভিমুখে চলিল।

সুমিত্রার শাশুড়ী অত্যন্ত ভাল মানুষ, নিরীহ গোছের লোক। কোন লোকের ভাল-মন্দে থাকেন না। একটিমাত্র ছেলের বৌ, কত আদরের কত আনন্দের বস্তু। তাই সুমিত্রা যখন আসিয়া হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং নতমুখে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া রহিল, তখন তাঁহার চোখের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল। এবং এমন শুভদিনটায় যে তিনি শারীরিক অসুস্থতায় শয্যাগত হইয়া রহিলেন—এই ক্ষোভে সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'থাক থাক। পায়ের কাছে বসে কেন মা। উঠে ব'স।'

সুমিত্রা নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। শাশুড়ী ঐ যে কথাটুকু বলিলেন, তাহার মধ্যে কত উদ্বেলিত স্নেহ রহিয়াছে তাহার কিছুই সে ধরিতে পারিল না। এই একদিনের মধ্যেই শ্বশুর-বাড়ীতে তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। এখানে কেবল স্বামী ছাড়া তাহার অপর কেহ শুভাকাঙ্ক্ষী যে আছে, আর অন্য কোন কোথাও স্নেহের প্রস্রবণ নিভৃতে আছে, ঐ কথা সে আদৌ অনুভব করিল না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শাশুড়ী মনোরমা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন 'কাদু, এই বন্ধ ঘরের মধ্যে একা একা ও আর কতক্ষণ বসবে বাছা? ওকে উঠিয়ে নিয়ে যা। চুলটুল বেঁধে দিয়ে, মুখ হাত ধুইয়ে কাপড় ছাড়িয়ে দে। না হয় ত ছাদে নিয়ে যা না একটু। সেখানে বেশ খোলা হাওয়া পাওয়া যাবে।'

সুমিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার শয়ন ঘরের সংলগ্ন ছোট একটি ঘরে আনিয়া কাদম্বিনী কহিল, 'বৌদি, চুল বেঁধে দেব?'

'না দরকার নেই কিছু, আমি নিজেই বেঁধে নেব'খন।'

'কিছু যদি না মনে কর তা হ'লে একটা কথা বলি বৌদি।'
দম্বিনী নিকটস্থ একটা চৌকিতে বসিল—'মা তোমাকে উঠে আসতে
লেন আর অমনিই তুমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে এলে। এটা তোমার
চিত হয় নাই। ঘর লোকে ছেলের বৌয়ের কাছে কত কি আশা করে।
কটু সেবা, একটু আত্তিসুয়োভাব। আমার মা অবশ্য মোটেই সেরকম
ভাবের নন। আজ পর্য্যন্ত তিনি মুখ ফুটে কখনও কারও কাছে
ছু দাবী করেন নাই। তবুও তুমি এমন ভাবটা দেখালে, যেন
মাকে কেউ জোর করে ধরে বেঁধে ওখানে রেখেছিল। উঠে আসতে
রলেই বাঁচ।'

সুমিত্রা কোন জবাব না দিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্বশুরবাড়ীতে যে পদে পদে এত বিধিনিষেধ, এত পরাধীনতা, এত
ইষ্কুতা দরকার হয়, সে কথা সে তাহার কলেজ-জীবনের শিক্ষার মাঝে
খনও শেখে নাই, বিয়ের আগের দিন পর্য্যন্ত কলেজে গিয়াছে, সঙ্গিনীদের
হিত অবাধে হাসি আলাপ গল্প আলোচনা করিয়াছে—সেখানে এমন
ধন ত ছিল না। এ যে প্রত্যেক জিনিস মাপকাঠি দিয়া মাপা।
ত্যেক কথা, প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক ব্যবহারের ভিতর হইতে চুনিয়া
রিয়া একশো রকম মানে বাহির করা—কে জানিত এত সব!

বাহিরে চটির শব্দ পাওয়া গেল। সুধীর হাস্যোজ্জ্বল মুখে ঘরে
কয়া কহিল, 'বাবা, এতক্ষণে ছাড়া পেলাম। সেই সকাল থেকে
রম্ভ করে—'

বাকী কথাটা আর শেষ না করিয়া সে একটা চেয়ারে বসিয়া
ড়ল।

কাদম্বিনী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সুধীর বলিল, 'কাদু,
নি তাড়াতাড়ি পালাচ্ছিস কেন? মনে করেছিস, দাদা বুঝি শুধু

বৌদির সঙ্গে গল্প করবার ছুতো খুঁজে পালিয়ে এসেছে না রে, সত্যি বড় ক্লান্ত লাগছে।'

হাসি চাপিয়া কানু বলিল, 'আমি বসে থাকি আর তুমি আমাকে মনে মনে অভিশাপ দাও আর কি! জানতে আর কিছু বাকী নেই কাত্নর। যাই বরঞ্চ তোমার জন্যে এক পেয়ালা চা, কিছু খাবার পাঠিয়ে দিই। বোধ হয় বিকেল বেলায় কিছুই খাও নাই।'

কাদম্বিনী দুয়ারের কাছ অবধি গিয়াছিল।

সুধীর ডাকিল, শোন্, খাবার পাঠাবার দরকার নেই। কিন্তু এক পেয়ালার বদলে দু'পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিস।'

চোখের কোণে সে চকিতে সুমিত্রার দিকে একবার চাহিয়া হাসিল। কাদম্বিনীও হাসিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া আসিল।

৫

বাহিরে তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে। সামনের রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া-পড়া গোটা দুই আমগাছের উপর রাঙা আভা পড়িয়াছে। শীতের অবসন্ন দিন ক্ষণিকের জন্য রাঙিয়া উঠিয়াছে। কাদম্বিনী হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল বটে, কিন্তু প্রকৃতির রাঙা-রঙের দিকে চাহিয়া তাহার মনটা সহসা বিবশ হইয়া উঠিল। প্রেমের যে উদ্বেলতার পরিচয়টুকু সে এইমাত্র নবদম্পতীর ঘর হইতে বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহারই সহিত নিজের জীবনের— দৈবক্রমে ঠিক এই সময়ে তাহার স্বামী যতীন অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশভাবে কি একটা কাগজের খসড়া হাতে এই দিকে আসিতেছিল। স্ত্রীর সহিত মুখোমুখি হওয়ায় বলিয়া উঠিল, 'এই যে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই হ'ল। তোমাকে এখনই ডেকে পাঠাচ্ছিলাম। দেখ দেখি এই ফর্দ্দটা, শ্বশুরমশায়

ছিলেন। বালকের প্রীতি-ভোজনের নিমন্ত্রণে তোমার এবং সুধীরের আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হয়। আমি ত যা পেয়েছি টামুটি নামগুলা লিখেছি। এখন তুমি একবার দেখে নাও যে কোনটা পড়ে গেল কি না।'

কাদম্বিনী বিরক্তি-সূচক কণ্ঠে কহিল, 'অত ভূতের বেগার খাটবার মার সময় নেই। তুমিও যেমন বেহায়া, তাই নিজের কাজকর্ম্ম ফেলে ার বিয়ের ভোজের ফন্দ করতে লেগেছ? কেন, তুমি কি বাড়ীর া নাকি? না, তুমি ছাড়া এই সব কাজ দেখবার আর লোক নেই?'

স্ত্রীর এই উল্টাপাল্টা কথার কোনও মানে খুঁজিয়া না পাইয়া যতীন াক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

'শোন বলি, একটা কথা আছে, আমার ঘরে এস একবার। না, র সময় হবে না?' কাদম্বিনী শ্লেষের স্বরে কহিল।

'চল, কিন্তু তোমার মেজাজ যে আজ ক'দিন থেকে কোন্ খাতে ছে কোনই কূলকিনারা পাচ্ছি নে।'

পুরানো দাসী নন্দা আসিয়া বলিল, 'এই যে দিদিমণি, তোমাকেই জ বেড়াচ্ছিলাম। রাত্রে ভাত হবে, না, লুচি হবে? নতুন-বৌদি খাবেন? মায়ের জন্তে যে পটলের ঝোল আর সুজির রুটি হবার ছিল তাই হবে ত? নীচে জামাইবাবুর চারজন বন্ধু এসেছেন। শরণ তাদের জন্তে চা করছে, চায়ের সঙ্গে কি জলখাবার দেওয়া ? রামশরণ জিজ্ঞেস করছে, ভাঁড়ার থেকে কমলালেবু মিষ্টি বার করে ো হবে, না, কি ব্যবস্থা হবে?'

কাদম্বিনী উত্তপ্ত স্বরে কহিল, 'কেন, আর কি বাড়ীতে লোক নেই? াকে সেই সকাল থেকেই রাত্রি বারোটা অবধি সংসারের সব তাল লাতে হবে? আমি ওসব কিছু জানি নে। তুই কেবল রামশরণকে

বলে আয়, চা হ'লে নূতন-বৌদি ও দাদাবাবুর জন্যে দু' পেয়ালা চা যেন তাদের ঘরে উপরে পাঠিয়ে দেয়। আর আমাদের জন্যেও পেয়ালা দুই চা দিয়ে যেতে বলিস্।'

নন্দা নীচে চলিয়া গেল। বস্তুতই সে বহু পুরাতন দিনের পরিচারিকা। এবং সংসারের সমস্ত বিলি ব্যবস্থার অধিকাংশ সে-ই করে। শুধু কাদম্বিনী মুখে মুখে অনেক কিছু হুকুম দেয়, মতামত দেয়। সেটাই দেখিতে শুনিতে ভাল হয়। নইলে নন্দা এমন সাতটা সংসারের ব্যবস্থা একলাই চালাইতে পারে। কাহারও সহায়তার দরকার হয় না। মনে মনে একটু হাসিয়া নন্দা বলিল, 'জামাইবাবুর সঙ্গে দিদিমণির নিশ্চয় কিছু খিটিমিটি লেগেছে। নইলে ত অন্যদিন দিদিমণি হাতে কিছু না করুক, মুখে হুকুম করতে আপত্তি করে না। মনটা বোধ হয় তার ভাল নেই। আর বলতে কি, আজকালকার সোয়ামীগুলোও হয়েছে তেমনি। হরদম পরিবারের কাছে ঘুর্ ঘুর্ করছে, আর অনবরত ফুসুর ফুসুর—কি যে অত কথা হয় কে জানে। কখন রাগ, কখন হাসি, সে ত হবেই। এই আমাদের দাদাবাবুকেই দেখ না, সবে ক'দিন বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে কোন্ ছলে কেমন করে বৌদিমণির কাছে গিয়ে গল্প করবে, সেই ছুতোই খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের সময়ে বাপু অত ছিল না।'

নন্দা চলিয়া গেলে যতীন চাপা হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া ঠাট্টার সুরে কহিল, 'সুধীর নতুন বিয়ে করেছে, দাদার সেই অনুরাগের বন্যা বোনটিতে এসে লাগল বুঝি?'

'কেন?'

'কেন আবার কি! বাইরে বন্ধুরা এসে অপেক্ষা করে রয়েছে। চারদিকে কত কাজ বাকী। আর তুমি ফরমাস করলে এইখানে দু'জনে মুখোমুখি বসে চা খেতে হবে—নিভৃতে কপোত কপোতী যথা। কিন্তু

তুমো খুঁচ্ছ যে, সুধীর বিয়ে করেছে আজ মাত্র পাঁচ দিন আর মাদের বিয়ে হয়ে গেল পাঁচ বছরের ওপর। ওরা ওপরে নিজেদের র চা ফরমাস করেছে বলে আমাদেরও তাই করতে হবে, এমন হাস্যকর থা তোমার মাথায় এল কেন?'

রাগে মুখ কালো করিয়া কাদম্বিনী কহিল, 'ফরমাস করতেও কপালে অবসর জুটবে না গো, জুটবে না। তোমাকে এখনই যেতে হবে, মার অসংখ্য কাজ, যাতে তুমি সারাদিন নাকি একবার নিশ্বাস লবারও সময় পাও না, আর আমাকে গিয়ে লাগতে হবে সংসারের' দীপনায়। কাজেই ওসব তুলনা তোল কেন?'

যতীন একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, 'আমি ত্য সত্যি আগে জানতুম না, মেয়েদের মন এত নীচ হয়। আচ্ছা যাক্, খন নীচে চললুম। বাইরে ভদ্রলোকেরা বহুক্ষণ থেকে অপেক্ষা রে রয়েছেন। রাত্রিতে তোমাকে গোটাকতক কথা বলব। যদি গ না কর।'

যতীন নীচে চলিয়া গেল।

ক্ষোভে অভিমানে নিজের প্রতি অসীম ধিক্কারে কাদম্বিনীর দু'চোখ টয়া জল পড়িতে লাগিল। সে আপন মনেই আপনি বলিতে লাগিল, কন আমার এমন হয়—দাদার বৌয়ের উপর। আমি কি এতই নীচ , এরই মধ্যে হিংসে করতে যাব? সবারই কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছি ঝতে পারছি অথচ তবুও নিজেকে সম্বরণ করতে পারছি নে! কে যেন মাকে জোর করে করিয়ে নিচ্ছে।

৬

কাদম্বিনী যখন একটুখানি হাসিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল তখন পশ্চিমের খোলা জানালা দু'টা দিয়া অস্তরবি-রশ্মি আসিয়া বধূর খোলা চুলে, বাহুতে, গ্রীবায়, কপোলে আসিয়া পড়িল। সুমিত্রার তখনও চুল বাঁধা হয় নাই। কাপড় ছাড়া হয় নাই। বৈকালিক প্রসাধনের সমস্ত কাজই বাকী। তবু এই ঈষৎ শ্রান্ত অবিন্যস্ত বেশবাসের উপর রাঙা আলো পড়িয়া যখন তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল তখন সুধীর অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এত সুন্দরও কেমন করিয়া মানুষে হয়।

চেয়ারের উপর একটু নড়িয়া চড়িয়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়া ঠিক কেমন করিয়া সে নববধূর সহিত আলাপ আরম্ভ করিবে ঠাহর করিতে গিয়া সুধীর ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া গেল। উপরের নূতন-ঝি একটি ট্রের উপরে দুই পেয়ালা চা আনিয়া টেবিলে নামাইয়া রাখিল।

একটি পেয়ালা হাতে করিয়া সে সুমিত্রার হাতে দিয়া তাহার খোলা চুলগুলি অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিতে করিতে কহিল, 'এখনও চুল বাঁধা হয় নি, এতক্ষণ কি করছিলে?'

সে কথার কোন জবাব না দিয়া সুমিত্রা চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়া কহিল, 'আচ্ছা আরও ক'দিন আমাকে এখানে থাকতে হবে?'

প্রশ্ন শুনিয়া সুধীর বিমনা হইয়া গেল। তাহার মনে কোথায় যেন আঘাত লাগিল। যতই আধুনিক বলিয়া গর্ব করুক এবং নব্যতন্ত্রের যতই মহিমা কীর্তন করুক, স্ত্রীকে আপন বাড়ী আনিয়া চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই যদি এমন প্রশ্ন শুনিতে হয়, তবে মনের কোথায় যেন ঘা লাগে।

সুধীর সুমি খোলাচুলের একগুচ্ছ আঙুলে জড়াইয়া কহিল, তুমি কি
াগির কলকাতা যেতে চাও না কি? আমাকে ত বোধ হয় এই
াহের মধ্যেই ফিরতে হবে। আর কলেজ কামাই করা কিছুতেই
বে না। কিন্তু ভাবছি, তুমিও এত শীঘ্র চলে গেলে বাবা-মা বোধ হয়
কটু ক্ষুণ্ণ হবেন।'

'তবে সেই ভেবে আমাকে এখানে পড়ে থাকতে হবে না কি?
ছাড়া তুমিই যখন থাকবে না—'

সুধীর সহসা কিছু জবাব দিতে পারিল না। তাহার সঙ্গেই সুমিত্রাকেও
লকাতা লইয়া যাইবার একটা প্রবল বাসনা তাহারও আছে। এত
কেমন করিয়া সে তাহার চির-পুরাতন হোষ্টেল-জীবনে গিয়া আবার
ত হইবে। এখনও যে নব-পরিচিতার অসীম রহস্য-মাধুর্য্যের একটুও
রচয় পাওয়া শেষ হয় নাই। সুমিত্রা যদি কলিকাতায় থাকে
দ অন্তত শনি-রবিবারেও সে তাহার সাহচর্য্য কাটাইতে পারিবে।
ছাড়াও একই শহরে যখন বাস হইবে, যখন তখন দেখা হইয়া
ওয়াটাও কিছু বিচিত্র নয়।

কিন্তু বাড়ীতে মা-বাবার উপর একটা দায়িত্ব আছে। সুমিত্রার
যখন তাহার বিয়ের সম্বন্ধ হয়, বড় মেয়ে বলিয়া মা একটু আপত্তি
নিয়াছিলেন। কিন্তু বাবা প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, বড় মেয়েই যে
যাজন। তোমার শরীর খারাপ, ছোট একটি মেয়ে বৌ হইয়া আসিয়া
বেরত বাপের বাড়ীর জন্য নাকে কাঁদিবে, সে হবে না। বড় মেয়ে
সুক, দু'দিনে আপন সংসার বুঝিয়া পড়িয়া লউক। তাহাদের জ্ঞান
আছে, এবং বয়সও যথেষ্ট হইয়াছে। এইটুকু অন্তত অসংশয়ে বুঝিবে,
জের সংসার বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া বাপের বাড়ীর জন্য কান্নাকাটি
ায় বিশেষ লাভ নাই।'

এখন এখানে আসিয়াই যদি সুমিত্রা যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে তবে ব্যাপারটা যেন কেমন দাঁড়াইবে সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

সুমিত্রা চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'ও কি, তোমার চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও কি এত ভাবছ, আমাকে বলবে না ?'

মধুর সহানুভূতির স্বর এবং তাহা আসিতেছে মধুরতর কোন কণ্ঠ হইতে। একথার কি উত্তর দেওয়া যায়। সুধীর অভিভূত স্বরে কহিল, 'কি ভাবছি, তোমাকেই যদি বলব না তবে কাকে আর বলব ? তুমি যে আমার সঙ্গে যেতে চাইছ এতে আমার মনে কত গর্ব, কত সুখ হচ্ছে সে আমি তোমাকে বোঝাব কেমন করে। কিন্তু ভাবছি মা-বাবার ঠিক মত হবে কি না। তাঁদের একান্ত অমতে—'

'কিন্তু এটাও তোমার বোঝা উচিত, তাঁদের জন্যে আমাকে বিয়ে করে আন নি। এনেছ নিজের সুখ-সুবিধার জন্য।'

একথারও জবাব সুধীর ঠিকমত দিতে পারিল না। তাহার মনে যে ভাব উঠিল তাহাতে আনন্দ এবং আঘাত দুই-ই আছে। সূর্যাস্তের আলো মিলাইয়া গেছে। সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারের আভাস জানালার বাহিরে দেখা যায়। সন্ধ্যাতারা হয় ত এখন উঠে নাই, কি উঠিয়াছে। এখানকার শাসন, বিধিনিষেধ, আড়ষ্টতা সত্ত্বেও সুমিত্রার মনটি মধুর এবং উদাস হইয়া উঠিতেছিল ক্রমশঃ। সুধীর কাছে থাকিলে তা-ই হয়। তখন জেলখানাকে আর জেলখানা বলিয়া মনে হয় না এবং বন্দীজীবনের মাঝেও যথেষ্ট মাধুর্যের উপকরণ আছে বলিয়া মনে হয়। সান্ধ্য হাওয়ায় তাহার খোলাচুল উড়িতেছে। সন্ধ্যার শাঁখের শব্দ শোনা যাইতেছে। সুধীরের হাতের ভিতর তাহার দুই করতল আবদ্ধ। স্বপ্নের ঘোর চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে।

যাই যাই করিয়া সুধীর আরও আট-নয় দিন থাকিয়া গেল। তাহার
না ব্যবস্থা দিয়াছেন, সুমিত্রা সঙ্গে যাইবে বটে, কিন্তু দিন পনেরর মধ্যেই
বার তাহাকে এখানে আসিতে হইবে। বাপের বাড়ী হইতে বাবা
ংবা ভাই সঙ্গে করিয়া যদি না আনিয়া দিয়া যাইতে পারেন, তবে
ীন গিয়া লইয়া আসিবে।

সুমিত্রা খুব সুখী। সে মনে মনে ভাবিতেছিল, একবার গিয়া পড়ি,
রপর কেমন করিয়া এত শীঘ্র আবার আমাকে আনিতে পারেন
খিব। এ কয়েকদিন কাদম্বিনীর সঙ্গে তাহার বড় একটা কথাবার্তা
নাই। ননদিনী রায়বাঘিনী বলিয়া যে অপবাদ ননদকে নূতন-বৌয়ের
ন্ট ভীতিপ্রদ করিয়া রাখে, সে সকল বালাই তাহার নাই। সে
ঙ্গে পড়িয়াছে, যথেষ্ট শিক্ষিত, বয়ঃপ্রাপ্ত, তাহার উপর কেহ অন্যায়
াচার করিতে পারিবে, এমন ভয় নাই। এবং সেই দিনটার পর
ত এইটুকু কেবল লক্ষ্য করিয়াছে, ননদ তাহাকে একান্তভাবে দূরে
ড়ার করিয়া চলে। না থাকে কোন কথাবার্তায়, না শিখাইতে আসে
ন কালনাকানুন। ঈষৎ হাসিয়া সে মনে মনে ভাবিয়াছিল, আমার
দরও যে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে, এ কথাটা বোধ করি এতদিনে ওর
ায় ঢুকিয়াছে, তাই দিনে-রাতে আমাকে শিক্ষা দিবার উত্তমটা তার
য়া আসিয়াছে।

আজ তাহাদের কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার দিন। সকাল ন'টার
ন যাওয়া হইবে। শাশুড়ী ভোরবেলা হইতেই ব্যস্ত হইয়া আছেন
ার আনুসঙ্গিক মঙ্গলাচরণে। তুলসীতলার পূর্ণ ঘটটা ঠিক আছে

কি না, আমের পল্লবটা নিখুঁত হইল কি না, মঙ্গলঘটের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, না বাকী আছে।

নন্দা আসিয়া ডাকিয়া দিল, 'বৌদিমণি, আপনাকে মা উত্তরের ঐ দালানে ডাকছেন। নাপতিন্ এসে অনেকক্ষণ থেকে বসে রয়েছে কি না।'

সুমিত্রা তখন স্নান সারিয়া আসিয়া তাহার দীর্ঘ এলো চুলের একটা ঢিলে খোঁপা বাঁধিয়া লইতেছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'বল গে, আমি এখনই যাচ্ছি।'

কাপড়চোপড় পরাও তাহার ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে। ট্রেনে যাইবে, ফিকে রংয়ের কাপড় পরিলে সহজে ময়লা হইয়া যাইবে, তাই পরণে তাহার কালো রংয়ের ক্রেপ্ডি শাড়ী, সেই রংয়ের ব্লাউজ।

ক্ষণকাল পরে হাতের কাজ শেষ করিয়া শাশুড়ীর কাছে যাইবামাত্র তিনি বলিলেন, 'আলতা পরতে হয় যে মা। ওটা একটা এয়োতি মেয়ের লক্ষণ। শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী যাচ্ছ ; কিন্তু তুমি এরই মধ্যে কাপড় ছেড়ে এসেছ, দামী কাপড় আলতার ছোপ লেগে নষ্ট হয়ে যাবে না ত!'

'না, নষ্ট হবে না। এখন বোধ হয় আর ছাড়বার সময় নেই। আমি সাবধান হয়ে বসছি।'

আলতা পরিবার সময় শাশুড়ী বলিতে লাগিলেন, 'যাচ্ছ, যাও মা। যত বেশী বয়সেই বিয়ে হোক, প্রথম বিয়ের পরে বাপের বাড়ীর জন্যে বড্ডই মন কেমন করে। কিন্তু বেশী দিন থেকো না। যত শীগগির সম্ভব চলে আসবে। দেখছ ত আমার এই শরীর। তোমার সংসার। এসে সব বুঝে পড়ে নিতে হবে।'

কৌমুদিনী কি একটা কাজে এই দিকে আসিয়াছিল, মায়ের শেষ কথাটা শুনিয়া তাহার মনে একটু রাগ এবং অভিমান হইল। এই ত

ক'দিন হইল মাত্র বিবাহ হইয়াছে, এরই মধ্যে মায়ের মুখে পঞ্চাশবার সেই এক কথা, 'তোমারই সংসার, তোমারই সব। সব বুঝিয়া পড়িয়া নাও।' মেয়ে কি এতই পর যে, যে ছোট হইতে এই সংসারের জন্য প্রাণ-পণ খাটিয়া মরিল, তবু তাহার একটা মর্য্যাদা নাই! না, মায়েরই বা কি দোষ। আমাদের এই সমাজের স্বার্থপর বিধিটাই যে তাই। ছেলেই সব। মেয়ে কেহ নয়। মাগো, তবু কেন যে লোকে ঘরজামাই রাখে। সারাজীবনটাই শুধু অশান্তিতে পুড়িয়া মরা।

সেও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'শুনলে ত বৌদি, বেশী দেরী করা চলবে না। উনি তা ছাড়া বলছিলেন, প্র্যাকটিস্ এসময়ে একটু জমে উঠেছে, আর কতদিন শ্বশুরের কাছে থাকব। এইবার কাছাকাছি ছোটখাট একটা বাড়ী দেখে উঠে যাব। তা হ'লে আমাকেও যেতে হবে। মা একেবারে একা পড়বেন।'

মা একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের পানে চাহিলেন। কই এমন কথা ত পূর্ব্বে আভাসেও শোনেন নাই।

শোনেন নাই বটে, কিন্তু কাদম্বিনী এখন ইচ্ছা করিয়াই বৌদির সামনে মাকে শুনাইয়া কথাটা বলিল। বাহিরে মোটর ঘন ঘন হর্ন দিতেছে। ট্রেনের সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। সুমিত্রার মন এসব সাংসারিক প্যাঁচ বা জটিলতার মধ্যে নাই তখন। সে কেবল মুক্তির কথা ভাবিতেছে।

৮

সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ কামরায় কেবল মাত্র তাহারা দুইজন। ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। অগাধ বেগবান সে গতি। কোথাও কোন বাধা নাই। তুরঙ্গগতির এই উল্লাস সুমিত্রার মনে সংক্রামিত হইয়া তাহাকে প্রাণময়ী করিয়া তুলিয়াছে। এই ক'দিন নূতন শ্বশুরবাড়ীতে যে

বাধাবন্ধনের মধ্যে কাটিয়াছে, তাহার পরে বিশেষ করিয়া ট্রেনের এই একাকী নিঃসঙ্কোচ অবাধ যাত্রা তাহার খুব ভাল লাগিতেছে।

পথে যাইতে যাইতে দু'জনে অনেক গল্প হইল। সুমিত্রা কহিল, 'দেখ, আমার ভারী ইচ্ছে বি-এটা পড়ি। তোমার কোন আপত্তি নেই ত? বিয়ে হয়ে গেলেই ঘরগেরস্থালীর তদারক করে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বাজে-কাজে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে হবে, এর কোন মানে নেই।'

সুধীর কহিল, 'তুমি কি পড়বে বা না পড়বে, সে সম্পূর্ণ তোমারই ইচ্ছে। তারও জন্যে আবার আমার মত নিতে হবে নাকি? কিন্তু আজকের দিনে অন্তত বি-এ পড়ার কথাই কেবল বলো না। কারণ তোমার বি-এ পড়া অক্ষয় হয়ে থাক, কিন্তু আজকের দিন জীবনে আর বেশী আসবে না।'

সুমিত্রা হাসিয়া উঠিল।

সুধীরের মনে তাহার মা-বাবার কথা বা তাঁহাদের মতামত বিধিনিষেধের কথা আগে যেটুকুও বা জাগিয়া মনকে দ্বিধান্দোলিত করিতেছিল, এখন সুমিত্রার সঙ্গে যতই আলাপ হইতেছে, সে ভাব ক্রমশই মুছিয়া যাইতেছে। সুমিত্রার কথা, তাহার হাসি, তাহার ভাবময় চোখের গভীর দৃষ্টি—দেখিতে দেখিতে অন্তরের সমস্তই জুড়িয়া বসিতেছে। আর কাহারও স্থান সেখানে নাই।

'তোমাকে কিছু খেতে দিই?' সুমিত্রা টিফিনকেরিয়ারের ঢাকাটা খুলিতে লাগিল। ফ্লাস্ক হইতে চা এবং খাবারের পাত্র হইতে কাচের প্লেটে পরিপাটী করিয়া খাবার সাজাইয়া স্বামীর হাতে দিল। শ্বশুর-বাড়ীতে এতদিন থাকিলেও সেখানে নববধূ ছিল। মাথার উপর গুরুজন, সঙ্কোচ, লজ্জা, কিন্তু এখানে ট্রেনের এই ছোট কামরাটিতে সে-ই গৃহিণী। খাইতে দেওয়া হইতে সুরু করিয়া বেঞ্চের উপর বিছানাটি পাতিয়া দেওয়া,

ট্রাঙ্ক. হইতে তোয়ালে বাহির করিয়া হাত মুছিতে দেওয়া, সমস্তই তাহারই গৃহিণীপনায় নিপুণভাবে সমাধা হইল।

সঙ্গে ঝি আছে, পাশের কামরায়। কিন্তু এই আনন্দ অভিযানে কোন ছোটখাট কাজের প্রয়োজনে তাহাকে ডাকিবার ইচ্ছা হইল না।

কলিকাতায় আসিয়া সুমিত্রা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবাধ জীবন। সেই সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে বিজলীবাতি জ্বলিয়া উঠিতেছে, পুরান বন্ধুরা প্রায়ই দেখা করিতে আসিতেছে। শনি রবিবারে স্বামীর সঙ্গে মেট্রো কিংবা চিত্রায় ভাল ফিল্ম দেখিয়া আসা। বিকেলের দিকটায় দু'জনে মিলিয়া প্রায়ই বেড়াইতে যাওয়া। কখন যে একমাস কাটিয়া গেল স্বপ্নের মত মনেও নাই। ওদিকে শ্বশুরবাড়ী ফিরিবার জন্য প্রত্যহ তাগিদ আসিতেছে। ফিরিয়া যাইতে মন চায় না। এই একমাস সুধীর এখানেই আছে। সুমিত্রার মা ছাড়েন নাই। আজকাল করিয়া তাহার সাবেক ছাত্রাবাসে ফিরিবার দিন ক্রমেই পিছাইয়া যাইতেছিল। অবশেষে স্থির হইয়াছে কাল ভাল দিন আছে, কাল সে ফিরিয়া যাইবে।

শীতের হিমবর্ষী জোৎস্না খোলা জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। ঘরের ভিতর দু'জনে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আসন্ন বিরহের পূর্ব্বাভাষে সুমিত্রার মন চঞ্চল। ম্লানমুখে সে কহিল, 'আর ত তোমাকে যখন তখন দেখতে পাব না।'

'আমি প্রায়ই আসব। তা ছাড়া রোজ আমাকে একটা করে চিঠি লিখবে ত? যেদিন তোমার চিঠি না পাব সেদিন রাত্রিতে আমার ঘুম হবে না।' সুধীর হতাশভাবে কহিল।

'এমনিতেই যে রাত্রিতে তোমার ঘুম হবে না।' সুমিত্রার মুখে ঈষৎ স্ফুরিত হাসি?'

'মানে ?'

'মানে, তোমাদের এই ফিফ্থ্ ইয়ার চলছে ত ? ডেলিভারি ক্লে
এবার তোমাদের নার্স-ভিউটিতে দেখা সুরু হবে নিশ্চয় ।'

ঈষৎ হাসিয়া সুধীর কহিল, 'তা হ'লেও যদি তোমার চিঠি পাই
তা হ'লে চেয়ারে বসে ঢুলতে ঢুলতেও স্বপ্ন দেখব। এবং সে স্বপ্নের সং
মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের কোনই সম্পর্ক থাকবে না !'

এমনই করিয়া হাস্য কৌতুকে আনন্দে দু'জনে দু'জনের মাঝে ম
হইয়া গেল। বাহিরে আরও যে জগত আছে, কর্ত্তব্য আছে, দাবী
দাওয়া আছে, সে সকল তাহারা একেবারে বিস্মৃত হইল।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়িয়া যাওয়ায় সুমিত্রা গম্ভীর হইয়া কহিল
'কিন্তু তোমাদের ওখানে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে যে বার বার তাগি
আসছে, তার কি ব্যবস্থা হবে ?'

এই একটা সমস্যাকে সুধীর প্রাণপণে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিতেছিল
তাহাদের আনন্দের উৎসধারায় এ সমস্যা যেন ভারি একটা পাথরের মত
চাপিয়া বসিয়া আছে। সুমিত্রার মতের বিরুদ্ধে জোর করিয়া কো
আদেশ জারী করা, সেও যেমন দুঃসাধ্য, এদিকে—মা-বাবার, বিশে
করিয়া রুগ্ন মায়ের একান্ত ইচ্ছাকে তুচ্ছ করা, তাহাও কষ্টকর
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারি
নে। আচ্ছা, তুমি প্রাইভেটে কি বি-এ পড়তে পার না ? তা হ'লে
তোমার ওখানে গিয়েও পড়াশোনার উপায় হতে পারে।'

'ও বাবা, সে কেমন করে হবে ? তোমাদের ওখানে কারও কাে
পড়াশোনা সম্বন্ধে হেল্প ত পাব না, তুমি থাকবে দূরে—কলকাতায়। তা
ওপর নানা সমালোচনা, নানা মন্তব্য আছে। তোমার মা-বোনের ঠি
পছন্দ হবে কি না আমার পড়াশোনা, তাও জানা নেই। খুব সম্ভ

পছন্দ হবে না। আমার যতদূর মনে হয়, ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই যতটুকু বুঝেছি, তোমার বোন আমাকে একেবারে পছন্দ করে না।'

সুধীর চুপ করিয়া খোলা জানালা দিয়া আকাশের একটা তারার দিকে চাহিয়া রহিল। এই বিহ্বল মাদকতার মধ্যেও কি একটা অনির্দ্দেশ্ত ব্যথা যেন মনে জাগিয়া ওঠে। জীবনের এই পরমতম আনন্দে কি সকলের সহিত মিলন না ঘটাইয়া বাধাই আনিবে? কাদম্বিনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। ছোট বোন, বাড়ীর সকলের আদরের, বিয়ের আগে এই সেদিন অবধি তাহার সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া চা খাইয়াছে, দুষ্টুমি করিয়া সে দরকারী পড়ার বই লুকাইয়া রাখিত। একবার এমিটিন্ ইঞ্জেক্সন্ লইয়া হাতে খুব বেদনা হইয়াছিল, কাদু ষ্টোভ ধরাইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় কম্প্রেস দিয়া দিতেছিল। ছেলেবেলার চাক্সার স্নেহের ইঙ্গিত হঠাৎ বায়োস্কোপের ছবির মত চোখের সুমুখে ভাসিয়া ওঠে। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বাহির হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া আবার প্রিয়তমের দিকে নিবদ্ধ করিল। অতীতের সেই কুহেলীজাল ধীরে ধীরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বর্ত্তমান ক্ষণটুকুকে উজ্জল করিয়া তুলিল আবার। সেখানে প্রিয়ার কেশ-সুগন্ধ মদির বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। গোলাপের মত অধরোষ্ঠ সরস ও প্রেমার্ত্ত। সুমিত্রা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, 'মাঝে মাঝে তুমি এমন গম্ভীর হয়ে ওঠ যে, দস্তুরমত ভয় হয়। মনে হয় গভীর দার্শনিক মন তোমার, আমাদের মত সাধারণ মানুষে কি তার পাত্তা পাবে? সন্ধ্যে বেলাটা এমন করে নষ্ট করছ কেন? একটা গান করি, শুনবে? সেদিন রেডিওতে সুর ধরে শিখেছি নিজেই। এস্রাজে তুলেছি, গানটা বাজাই, শোন।'

৯

এস্রাজ বাজান শেষ হইবামাত্র সুমিত্রার মা চায়ের পেয়ালা এবং খাবারের রেকাবি লইয়া ঘরে ঢুকিলেন।

'কোথায় বেরিয়েছিলে বাবা? আজ জল খেতে তোমার সন্ধ্যে হয়ে গেল।'

সুধীর সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হাত বাড়াইয়া রেকাবি গ্রহণ করিয়া বলিল, 'মা, আমি ত প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল ফিরে এসেছি। কিন্তু এত খেতে পারব না। আপনি খাওয়া নিয়ে এত ব্যস্ত হ'ন যে বলবার নয়।'

'তা হোক, এই ত কাল চলে যাবে। তখন কি আর ব্যস্ত হতে পাব, না যত্ন করতে পাব? নাও, তুমি খেতে ব'স। সুমি, এঘরে একবার শুনে যা।'

সুমিত্রা পাশের ঘরে আসিয়া বলিল, 'কি বলছ?'

'না, এখানে নয়। ভিতরে একবার আয়। আমি সন্দেশের রসটা চড়িয়ে এসেছি।'

ভিতরের দিকে বারান্দায় তোলা উনুনে রসের কড়া চাপানো ছিল, খুন্তি দিয়া রসটা ঠিকমত গাঢ় হইয়াছে কি-না পরীক্ষা করিতে করিতে মা বলিলেন, 'এসব কি কথা তুমি তোর মুখে? এই কয়েকমাস মোটে বিয়ে হয়েছে এরই মধ্যে জামাইয়ের কাছে তার বোনের বিরুদ্ধে কথা কথা। আমি খাবারের থালা হাতে দিতে আসছিলাম, তোমার দু'-চারটে কথা কানে গেল। তুমি না লেখাপড়া শিখেছ, অথচ অশিক্ষিত মেয়েদের মত এত ছোট মন কেন তোমার? লোকে বিয়ে ক'রে শান্তি চায়। অশান্তি নিশ্চয় চায় না। সে তোমাকেও ভালবাসে, আর ছোট্ট বোন

বা মা—তাঁদেরও ভালবাসে। একজন স্নেহের পাত্রীর মুখে অপর স্নেহভাজনদের নিন্দা শুনলে বা অবনিবনাও হবার সম্ভাবনা বুঝলে যে কতখানি কষ্ট হয় তা কি বুঝতে পার না? ছিঃ, তুমি যে আমাদের কাছে এত শিক্ষা পেয়েও এমন করবে তা কে ভেবেছিল। এ সমস্তই তোমার বাবার দোষে হয়েছে। তিনি ছোট থেকেই মেয়ের স্কুল কলেজের পড়ার কথা আর পড়ার ব্যবস্থা নিয়েই উন্মত্ত। কিন্তু কলেজের পড়া পড়, তাতে ক্ষতি নেই, অথচ এ পড়া ছাড়াও ঘর-সংসারের শান্তি-সুখ বজায় রাখতে মেয়েমানুষকে আরও যে কত শিখতে হয়, তুমি তার খবর রাখ নাই। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, সময় এলে নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে তুমি সমস্তই বুঝতে পারবে। এখন দেখছি অতখানি আশা করা আমার ভুল হয়েছিল।'

সুমিত্রার মনে প্রচণ্ড অভিমান হইয়াছিল। একে ত আজ অবধি বাড়ীতে কখনও কাহারও কাছে বকুনী খায় নাই। বাড়ীতে ছোট মেয়ে বলিয়া পিতার কাছে এবং অপর সকলের কাছে চিরদিন অত্যধিক আদরই পাইয়া আসিয়াছে। আজ হঠাৎ মায়ের মুখে এমন কড়া কথা শুনিয়া রাগ এবং অপমানে তাহার মনের ভিতরটা পুড়িয়া যাইতে লাগিল। উদ্ধতস্বরে সে কহিল, 'সমস্ত অবস্থাটা না বুঝে উপদেশ দেওয়া খুব সোজা। তোমরা আমাকে কলেজে লেখাপড়া শিখিয়ে এক সেকেলে বাড়ীতে বিয়ে দিয়েছ। সেখানেই সমস্ত বশ্যতা স্বীকার করে আমি আমার জীবনটা নষ্ট করতে পারব না।— এবং সুখের বিষয় আমার স্বামীরও তাতে মত নেই।'

মেয়ের মুখে এমন জবাব শুনিয়া বেদনায় মায়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মাসখানেকের মধ্যেই সুমিত্রাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইল। না গিয়া উপায় রহিল না। এদিকে মা লাগিয়াছেন পিছনে, ওদিকে বাবার কাছে শ্বশুরের দিক হইতে ঘন ঘন তাগিদ আসিতেছে। সুমিত্রা একদিন রাগিয়া উঠিয়া মাকে কহিল, 'বিয়ে দিয়েছ, দিয়ে বিদায় করবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছ দেখছি ; আর সবুর সইছে না।'

'অমন কথা বলিস নে—' সুমিত্রার মা ছল ছল চোখে কহিলেন, 'নিজের যখন ছেলেমেয়ে হবে তখনই বুঝতে পারবি। কিন্তু মেয়েমানুষে শ্বশুরবাড়ীতে স্নেহ এবং সম্মানের সঙ্গে আশ্রয় পেল, এ যে কত বড় কথা এবং এইটুকুর জন্যে বাপ-মায়ের মনে কত বড় দুশ্চিন্তা থাকে তা যদি বুঝতে পারতিস—'

এবার আর সুধীর সঙ্গে যাইতে পারিল না। পঞ্জিকা মিলাইয়া কোন এক শুভদিন দেখিয়া তাহার নন্দাই যতীন তাহাকে লইতে আসিল। সপ্রতিভ, চটপটে। মুখে স্মিতহাস্য লাগিয়াই আছে। যেদিন সে আসিল সেদিন দুপুর বেলায় সুধীরকেও এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হইল। খাইতে বসিয়া সে হাসিয়া কহিল, 'বৌদি, আমাদের বাড়ীর মধ্যে এত কি ভীতির বস্তুর পরিচয় পেলেন যে, তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে পথ পেলেন না! চেয়ে দেখুন দেখি এ মুখে ভয় পাবার মত কি আছে?'

সুমিত্রা বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইল। সামনেই বসিয়া সে পাখা করিতেছিল। যতীনের সহিত তাহার ঠাট্টার সুবাদ, তাই কথাটা পরিহাস করিয়াই সে কহিয়াছিল। কিন্তু সুমিত্রার তাহা ভাল লাগিল না। মনে মনে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার মা পরিবেশন

করিতেছিলেন।' বলিলেন, 'ছোট মেয়ে বলে ও বাপের বড় আদরে মানুষ হয়েছে। যদি না বুঝে তোমাদের কাছে কোন দোষঘাট করে ফেলে ক্ষমা করো বাছা। শিখিয়ে নিয়ো।'

যতীন কৌতুকের সুরে কহিল, 'বাপরে, সে কি কথা? উনিই আমাদের কত শেখাবেন। কিন্তু দেখুন মা, দু'জনে দু'দিক থেকে ব'সে আমাকে অভিসম্পাত করছেন—' বলিয়া সে কটাক্ষে সুধীরের দিকে ও সুমিত্রার দিকে চাহিল। 'আমিই ওদের দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবার উপলক্ষ্য হলুম। আচ্ছা, বলুন ত কি ভীষণ অপ্রীতিকর দায়িত্ব আমায় নিতে হয়েছে।'

সুধীর উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'আঃ—যতীন, থাম খুব হয়েছে। গুরুজনের সামনে ওসব বাজে রসিকতা আর নাই বা করলে?'

সুধীরের মন আসন্ন বিচ্ছেদ ভাবিয়া ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। এইসব খাওয়ান দাওয়ান হাসি গল্প তামাসা তাহার অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল। শয়নঘরে নির্জ্জন অবকাশে স্ত্রীকে পাইয়া বলিল, 'তুমি কিছু ভেব না সুমি। তোমার যদি ভাল না লাগে, চলে আসবে। ইতিমধ্যে তোমার থার্ড ইয়ারের খবরটা বার হোক তারপর যা ভাল বুঝবে—করবে। আমার যতটুকু সাধ্য প্রাণপণে তোমাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করব।'

ইহার পর উচ্ছ্বাসের মাত্রা আরও এককাঠি চড়াইয়া বলিল, 'আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। নইলে হয় ত তোমাকে এত কষ্ট পেতে হ'ত না।'

ভাবময় কম্পিত সজল একটি কটাক্ষপাত দ্বারা সুমিত্রা সে কথার জবাব দিয়া চুপ করিয়া রহিল। হৃদয় যেখানে কান্নায় কান্নায় ভরা, বাক্য সেখানে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

যাইবার সময় সুধীর কহিল, 'তোমার এস্রাজটা নিয়ে যেও, আর নতুন যে বইগুলা কিনে আনলুম কাল, নিতে ভুল না।

সুমিত্রা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলিল, 'ওখানে আবার বই নিয়ে গিয়ে কি হবে। এস্রাজটাই বা কি কাজে লাগবে?'

'লাগবে গো লাগবে। যতটা ভয়ের কথা মনে করছ তা নয়। জীবনে সকল অবস্থাতেই আনা যায় একটা সামঞ্জস্য।'

'আচ্ছা থাক না মশায়ের লেক্‌চার। এইটুকু শুধু মনে রেখ, আজই রাত ন'টার ট্রেনে চলে যাচ্ছি।'

'সত্যি আমি কি যে বকছিলুম—' সুধীরের গলার স্বর অনুতাপে বিগলিত। 'ঘড়িতে এরই মধ্যে সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ। আচ্ছা যদি তুমি সেই গানটা—'

সুমিত্রা স্মিত হাসিয়া এস্রাজটা খুলিয়া অতুলপ্রসাদের সেই চিরমধুর গানখানি গাহিল—

"বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে
তুমিও একাকী আমিও একাকী
আজি এ বাদল রাতে।"

গান শেষ হইলে সুধীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'আমি ত গানের সুরে মনের কথা কইতে পারব না, কেবল আর একটি গানের দু'টি লাইন তোমার কানে বলে যাই—

"তোমায় নূতন করে পাব বলে
হারাই অনুক্ষণ, ওগো আমার ভালবাসার ধন।"

ঠিকা ঝিটা আসিতে পারে নাই বলিয়া বামুনঠাকুর খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল। এবং এই অবেলায় নিজেই রান্নাঘর ধুইয়া উনুনে আঁচ দিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহার মুখের বকুনি এবং হাতের কাজ সমানেই চলিতেছিল। পুরান ঝি নন্দা তাহার মা মরিয়াছে বলিয়া মাস খানেক ছুটি লইয়া চলিয়া যাওয়াতেই এই সব অঘটন ঘটিতেছে, বামুন-ঠাকুর নানাপ্রকার যুক্তি দিয়া এই কথাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল। উপরের বারান্দা হইতে বাড়ীর গৃহিণী, সুমিত্রার শাশুড়ী হাঁকিয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে ঠাকুর, অত চীৎকার করছ কেন?'

ঠাকুর শ্রোতা পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বকিতে লাগিল, 'আর বলেন কেন মা, সন্ধ্যে হতে চললো, এখনও কোন কাজের বিলি ব্যবস্থা নেই। ঝি আসে নি, ভাঁড়ার বার হয় নাই, কুটনো কোটা হয় নাই, এমন করে কি কাজ চলে? জামাইবাবু খেতে এলেই বা কি খেতে দিই, তার উপর বাবুর লুচি, রাবড়ি। দিদিমণির পথ্যি, আপনার সাবু—'

গৃহিণী ক্লান্ত কণ্ঠে কহিলেন, 'বৌমা কি করছে, যাই তাকে ডেকে দিই! নীচে এসে অন্তত আজকের মত একটা বিলি ব্যবস্থা করে দিক।'

সুমিত্রার কক্ষের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া তিনি ডাকিলেন, 'বৌমা! ও বৌমা!'

সুমিত্রা তখন একখানা ইংরেজী উপন্যাস পাঠে তন্ময় হইয়াছিল। পুস্তকের পাতা হইতে চোখ না তুলিয়াই কহিল, 'কি বলছেন মা?'

সে যেমন চেয়ারে বসিয়াছিল তেমনই রহিল, বই হইতে মুখও তুলিল না। শাশুড়ী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অপর কোন ঘরে অন্য কোন শাশুড়ীর সম্মুখে এবম্বিধ বিসদৃশ আচরণ

ঘটিলে হয় ত একটা কাণ্ড বাধিয়া যাইত। কিন্তু সুমিত্রার শাশুড়ী মনোরমা খুব সহিষ্ণু ও ধীর প্রকৃতির ছিলেন। কাহাকেও বিচার করিবার আগে নিজে অভিভূত না হইয়া যথাসম্ভব নির্লিপ্তভাবে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। এ ক্ষমতা বহু শিক্ষিত এবং শিক্ষিতার নাই। কিন্তু সে কালের গৃহিণীদের মত অল্প স্বল্প লেখাপড়া শিখিয়াও এই দুর্লভ গুণ তাঁহার ছিল।

তিনি বুঝিতে পারিতেন, কেবল কলেজে গিয়া ও পড়া মুখস্থ করিয়া সুমিত্রার কেতাবি বিদ্যা হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরা সংসারের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিয়া যে সকল সাংসারিক বুদ্ধি বিবেচনা, শ্রদ্ধাভক্তি, কর্মকুশলতা প্রভৃতি শেখা যায়, সেদিকটা একেবারে শূন্য। হয় ত বাপের আদরের ছোট মেয়ে ছিল, মা-বাপ অন্ধ স্নেহে মনে করিয়াছিলেন জীবনের এই সব দায়িত্বময় কঠিন কর্তব্যগুলা বিয়ের পরেই যেমন করিয়া হোক শিখিবে। এখানে এখন যে ক'টা দিন আছে লেখাপড়া গান-বাজনা হাসিখুশী করিয়া কাটাইয়া দিক। বধূর এই অসম্পূর্ণতা নিয়া অনেকদিন তিনি নিঃশব্দে অনেক উদ্বেগ বোধ করিয়াছেন। তাঁহার কাছে যতদিন আছে ততদিন না হয় একরকম করিয়া কাটিয়া যাইবে, কিন্তু ইহার পর উহাকে ত একটা পুরা সংসারের কর্ণধার হইয়া তাহার ভাল মন্দ সুখ দুঃখ সকলই হাতে তুলিয়া লইতে হইবে। সস্নেহে মৃদু তিরস্কারে তাহাকে শিখাইবার জন্যও অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই। আজও না রাগিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'বৌমা, বই ছেড়ে একবার এদিকে যাবে না মা? কাতুর অরুচি হয়েছে, সে বিছানায় পড়ে আছে। মাথা তুলতে পারছে না। সমস্তই কেমন গোলমাল হয়ে গেছে, কোন জিনিসের একটা শৃঙ্খলা নেই, শ্রী নেই। আমি জানি তুমি একবার গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সুমিত্রা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখে তখনও ঘোর লাগিয়া রহিয়াছে। সে উপন্যাসের যেখানটা পড়িতেছিল সেখানে প্রেমের কি অপূর্ব্ব বর্ণ সমাবেশ! মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভবের কি চমৎকার বিশ্লেষণ!

'আমি এখনই যাচ্ছি মা, এইখানটা একটু বাকী আছে, শেষ করেই চল্লুম।'

বই শেষ করিতে করিতে বৈশাখের অপরাহ্ন বেলা ঘনমেঘভারে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। প্রথম বৃষ্টিপাতের পর ভিজা মাটির একপ্রকার অপূর্ব্ব সুগন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুমিত্রা বইটা মুড়িয়া রাখিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। তাহার বিরহ ব্যথাতুর হৃদয় হইতে একটি অব্যক্ত ব্যাকুলতা উত্থিত হইয়া মেঘ-সমাকুল আর্দ্র ধরণীর সহিত মিশিয়া গেল। কিছুকাল পরে সহসা স্মরণ হইল শাশুড়ী একবার নীচে ভাঁড়ার ঘর রান্নাঘরের তদারক করিতে যাইতে বলিয়াছিলেন। মাথার এলো চুলটা হাতে জড়াইয়া লইয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। ততক্ষণে বামুনঠাকুর নিজেই কোনমতে জোগাড়যন্ত্র করিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়াছে। বৌকে এতক্ষণ পর নামিয়া আসিতে দেখিয়া কহিল, 'কাজকর্ম্ম কোনরকম করে হয়ে গেল বৌদিমণি। মা বাতে নীচে আসতে পারবেন না, তাই তার উপরে তাঁকে ও কারীর ডালাখানা দিয়ে এলুম। ঐখানে বসেই তিনি কুটনো কুটে দেবেন।'

যতীন এই সময় 'ল' চেম্বার হইতে ফিরিল। আরও আগেই হয় ত ফিরিত, ঝড়বৃষ্টির জন্য আসিতে পারে নাই। রান্নাঘরের বারান্দায় সুমিত্রাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, 'এ কি বৌদি! স্বপ্ন দেখছি নাকি? আপনি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে! চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না।'

সুমিত্রা বলিল, 'আপনি ত শ্লেষ করে ছাড়া আমাকে কথা বলেন না। এর মধ্যে আর এমনই কি আশ্চর্য্য দেখলেন? বরঞ্চ বেশীর ভাগ সময় রান্নাঘর ভাঁড়ারঘরে কাটাতে পারি নি বলে কত লোকেই কত কথা বলে।'

যতীন বলিল, 'দোহাই বৌদি, আমার সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। আপনি একটু ভুল করলেন, শ্লেষ করে কথা ত আমি বলি নে। মাঝে মাঝে তামাসা করি মাত্র, আর সেটাও ঠাট্টার সুবাদ বলেই। এখন উপস্থিত ক্ষুধিতকে অন্নদানের পরিবর্ত্তে এই তৃষ্ণার্ত্তকে যদি এক পেয়ালা চা দেন তা হলে আনন্দের অবধি থাকে না।'

সুমিত্রা চায়ের কেটলিতে জল ভরিয়া আনিবার আদেশ করিয়া ঠাকুরকে বলিল, 'তুমি কি চড়িয়েছ, একটা উনুন খালি করে দাও। আমি চায়ের জল চড়াব।'

ঠাকুর কিন্তু দ্বিধা করিয়া বলিল, 'বৌদি, যদি ষ্টোভটা ধরিয়ে নিতে পারেন, ভাল হয়। উনুনে ভাত চড়িয়েছি নামালে নষ্ট হয়ে যাবে।'

সুমিত্রা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, 'তোমরা বড় মুখের উপর জবাব কর, বলছি যা তা-ই শোন। এখন ষ্টোভ ধরাবার আমার সুবিধে হবে না। কোথায় দেশলাই কোথায় স্পিরিট খুঁজে বেড়াব।'

ঠাকুর বিষণ্নমুখে তাড়াতাড়ি ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া ফেলিল।

চা তৈয়ারী শেষ হইলে সে যতীনকে এক পেয়ালা দিয়া পরে, শাশুড়ীর জন্য ও ননদের জন্য দু'পেয়ালা চা লইয়া গেল, একটু আগেই বধূর অবাধ্যতার জন্য মনোরমা দেবীর মনটা গম্ভীর ও অপ্রসন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহাকে নিজের হাতে চায়ের পেয়ালা বহন করিয়া আনিতে দেখিয়া বিগলিত হইয়া কহিলেন, 'এই যে বৌমা, নিজের হাতে চা এনেছ মা! আমিও ঠিক মনে মনে ভাবছিলুম, বৃষ্টি হয়ে ঠাণ্ডা পড়ে গেল। এই সময় এক পেয়ালা চা পেলে বেশ হয়।'

'যতীনকে চায়ের সঙ্গে কিছু খেতে দিয়েছ?' শাশুড়ী আবার প্রশ্ন করিলেন।

'না, উনি শুধু এক পেয়ালা চা চাইলেন।'

'না চাইলেও দিতে হয় বৌমা। ঘর-সংসার চালানোর এই সব ছোটখাট জিনিসগুলো এইবার শেখ। সেই দশটার সময় চারটি নাকে মুখে গুঁজে যতীন কোর্টে বেরিয়েছিল, আর এই ফিরলো। ও যতীন! যতীন!' তিনি উচ্চ স্বরে ডাকিলেন।

যতীন দোতালাতেই তাহার স্ত্রী কেমন আছে দেখিতে গিয়াছিল। তাহার আহ্বানে এ ঘরে আসিল।

'তুমি কিছু খেলে না কেন বাবা? আমি ততক্ষণ এই প্লেটে আম কেটে দিই। বৌমা, তুমি ঐ খাবারের আলমারিটা খুলে দেখ ও-বেলার সন্দেশ রয়েছে, সাজিয়ে দাও।'

যতীন এইমাত্র তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। বেচারা খুবই কষ্ট পাইতেছে। প্রথম মাতৃত্ব লাভের বেদনার অংশটা এখন তাহার উপর দিয়া ঝড়ের মত বহিয়া চলিয়াছে। সমস্ত দিন প্রায় কিছুই খায় নাই এবং বিছানা হইতে উঠিতেও পারে নাই। সারাদিন একলা কাটাইয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। একবার খাবার জল সোরাই হইতে গড়াইতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। যতীন ক্ষুব্ধ হইয়া একটুখানি আগে স্ত্রীকে প্রশ্ন করিয়াছিল, 'কেন, বৌদি কি মাঝে মাঝে এসে বসতে পারেন না?'

প্রত্যুত্তরে কাদম্বিনী বক্র হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, 'ও বাবা, ওঁর অবসর কই? সারাদিন বই পড়তে আর চুল বাঁধা কাপড় ছাড়াতেই কেটে যায়। তা ছাড়া এ সব বাজে কাজ ওঁর প্রতিভাময়ী প্রকৃতি বরদাস্ত করে না।'

শুনিয়া যতীন ব্যথিত হইয়া এইমাত্র সেখান হইতে উঠিয়া আসিতেছে। সুমিত্রাকে শিক্ষিতা জানিয়া তাহার উপর যতীনের বরাবরই খুব শ্রদ্ধা ছিল। আশা করিয়াছিল, এইবার পরিবারের ভিতর যথার্থ শিক্ষিতা একজন আসিতেছেন, যিনি সেবায়, কুশলতায়, শিক্ষায় গৃহে একটা নূতন মাধুর্য্য আনিবেন। তাই কাদম্বিনী যখন প্রথম প্রথম এই সব ব্যাপার লইয়া ঈর্ষাবিজড়িত কথাবার্ত্তা কহিত, তখন স্ত্রীকে সে যথেষ্ট বকিয়াছে। আজ কিন্তু মনে তাহার অতখানি শ্রদ্ধা আর নাই। সংশয়ের কালোছায়া পড়িয়াছে সেখানে। শিক্ষিতা হইয়া যিনি পরকে লেশমাত্র আপন করিয়া লইতে পারিলেন না, বই-পড়া ছাড়া বাস্তব জগতের সকল কাজে যাঁহার অনভিজ্ঞতা ও অবজ্ঞা, সে শিক্ষাকে কোন পুরুষই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারে না। এমন কি—

যতীন আপন মনে এ সন্দেহও করিয়াছে, সুধীর আজকের দিনে মোহে যতই আচ্ছন্ন হইয়া থাক, স্থায়ীভাবে স্বামীর শ্রদ্ধা এবং স্নেহ অর্জ্জন করিতে গেলে যে যে গুণের প্রয়োজন, সুমিত্রার মাঝে তাহার অভাব। এবং সে অভাব পূর্ণ করিয়া লইতে তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। বরঞ্চ এদিকটাকেই সে একান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত দেখে।

তাই মনোরমা দেবী যখন সুমিত্রাকে তাহার জন্য খাবার সাজাইতে আদেশ করিলেন, তাহার ভাল লাগিল না, কহিল, 'মা, এসব ছোট খাট কাজে কেন বৌদিকে ভাক্ত করছেন। হয় ত ওঁর পড়াশোনা প্রভৃতি বড় বড় কাজের ক্ষতি হচ্ছে। তা ছাড়া আমি কোর্টে একবার টিফিন খেয়েছি। তাড়াতাড়ি জলখাবারের জন্য এত কিছু ব্যস্ত হবার নেই।'

সুমিত্রা নিজেকে সংবরণ করিতে কোন দিনই শেখে নাই। আজও যতীনের শ্লেষ বাক্য শোনা মাত্র সে কটুকণ্ঠে জবাব দিল, 'আপনি যে কেন আমার পিছনে এত লাগেন বুঝতে পারি নে। আমি লেখাপড়া

করে থাকি সেটা আমার মতে এমন কিছুই নিন্দনীয় নয়, যার জন্যে আপনাকে এমন ভাবে আমার সম্বন্ধে কথা কইতে হবে।'

মনোরমা দেবী অনেক দিন অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। শাশুড়ীর সামনেই নন্দাইয়ের মুখের উপর এতবড় রূঢ় ভাষণ করিতেও যে একটুমাত্র দ্বিধা করিল না, তাহাকে তাঁহার কি-ই বা বলিবার আছে, আর শিখাইবারই বা কি আছে।

যতীন উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সুমিত্রা শক্ত পাথরের মত কিছুক্ষণ সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। মনোরমা কহিলেন, 'বৌমা, তুমি যদি তোমার স্বামীর গুরুজন এবং স্নেহাস্পদ আত্মীয়দের কখনই আপন ভাবতে পারবে না, কখনই শ্রদ্ধা ভক্তি করতে পারবে না, যদি কেবল বিবাহিত জীবন বলতে স্বামীটিকেই চিনে থাক, তার বাইরে আর সবই মিথ্যা বলে মনে হয়, তবে ঘরকন্নার মাঝে রাতদিন অশান্তি করার চাইতে তুমি তোমার স্বামীকে বা বাপ-মাকে লেখ, তাঁরা তোমাকে নিয়ে যাবেন। সেখানে গেলে যা করলে তুমি তৃপ্তি পাও, তাই কর। আমি বারণ করব না, তোমার শ্বশুরকেও বারণ করতে মানা করব। কারণ,এ ধেড়ে মেয়েকে শেখাবার চেষ্টা বৃথা, একেবারেই বৃথা। তোমরা একালের মেয়েরা যা শিখেছ এতদিন তাই নিয়ে গর্ব্বে অহঙ্কারে জমে পাথরের মত হয়ে গেছ। তোমাদের সে মত—সে শিক্ষা-দীক্ষাকে এতটুকু নড়িয়ে আর কিছু শেখাই সে সাধ্য কি!'

ইহার চেয়ে বেশী কড়া কথা মনোরমা তাঁহার জীবনে কখনও বলেন নাই। তাও আবার বলিতে হইল তাঁহার বড় স্নেহের পাত্রী একমাত্র বধূকে। খুবই অশান্তি ও দুঃখে তাঁহার মনটা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

সুমিত্রা একটী কথামাত্র না কহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন মনোরমার মনে হইতে লাগিল, আহা ছেলেমানুষ, বাপ-মা ছাড়িয়া আছে,

উঁহাকে অমন করিয়া বকা উচিত হয় নাই। কতই বা আর বয়স, খুব যদি বেশী হয় আঠার-উনিশের বেশি হইবে না, সে সংসারের এখনও জানে কি? আর তা ছাড়া উঁহারও অত দোষ নাই, যত দোষ ওর বাপ-মায়ের। মেয়ে নিয়মিত সময়ে কলেজে গেছে ও পড়া মুখস্থ করিয়াছে' ইহার চেয়ে বেশী শিক্ষা আর তাঁহারা দেন নাই।

ঝি মানদাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, 'মানু, যা ত মা, দেখে আয় একবার বৌমা কি করছে? আমার নাম ক'রে ডেকে আন্ একবার। রাত হয়ে গেছে, অত রাত অবধি পড়লে শরীর খারাপ হবে। বল গে, মা বললেন, খেয়ে নিন, মায়ের ঘরে আপনার ঠাঁই ক'রে দেওয়া হচ্ছে। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করবেন। বেশী রাত জেগে পড়লে চোখ খারাপ হবে।'

১২

মানদা ক্ষণকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'মা, বৌদিদি একমনে পত্র লিখতে লেগেছেন—বোধ হয় দাদাবাবুকে। আমার কথা কানে গেল না।'

কিছুক্ষণ আগে মনোরমার মন স্নেহপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু চিঠি লিখিবার কথা শুনিয়া আবার মনটা বিরূপ হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত তর সহিল না গো, এখনই সাতখানা করিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন!

কাদম্বিনী আস্তে আস্তে এ ঘরে আসিয়াছিল। করুণ স্বরে বলিল, 'আমি সব শুনেছি মা। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেমনই ব্যবহার করুক, ওঁকে অপমান করতে গেল কেন বৌদি! এতে আমাদের মনে বড় লেগেছে।'

মনোরমা মুখে বধূর দোষ স্খালন করিবার জন্য যদিও বলিলেন, 'ছেলেমানুষ ওর কথা অত ধরতে নেই মা। তা ছাড়া ছোট থেকে কেবল কেতাবী বিদ্যেই শিখেছে, সংসারের হাল-চাল রীতি-নীতি শিখে নেই। আমরাও যদি হাল ছেড়ে বসে থাকি, ওকে শিখিয়ে না নিই, তা হ'লে ভবিষ্যতে ওদের কি দুর্গতি হবে ভাবতেও ভয় লাগে।' কিন্তু মন তাহার ব্যথিত ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল।

আরও কিছুক্ষণ পরে তিনি দাসীকে পাঠাইলেন—'যা ত, দেখে আয় বৌমার যদি চিঠি লেখা শেষ হয়ে থাকে, তাকে ডেকে দিয়ে আয়।'

দাসী আসিয়া খবর দিল যে, বৌদির ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ, ডাকাডাকি সত্ত্বেও তিনি দ্বার খুলিলেন না কিছুতেই।

সুমিত্রা অনেক রাত অবধি জাগিয়া তাহার মনের সকল ক্ষোভ, সকল ব্যথা উজাড় করিয়া স্বামীকে লিখিল—

'এই একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, এ বছরের প্রথম বৃষ্টি। স্নিগ্ধ হাওয়া ও মেঘব্যাকুল আকাশের দিকে চেয়ে তোমার কথা মনে পড়ছে। কিন্তু বাইরের আকাশের মতই আমারও সমস্ত হৃদয় ব্যথার অন্ধকারে ভরে রয়েছে। তোমার স্নেহের স্পর্শ যদি এখন পেতুম হয় ত সে সমস্ত অবরুদ্ধ ক্লেশ চোখের জলে ঝরে পড়ত। কিন্তু তুমি কাছে নেই, তাই সমস্ত ভিতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে।

'এক এক সময় ভাবি, মানুষের জীবনে সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি ঠিক এত বড় অসৌন্দর্য্য, এত হৃদয়হীনতা, এত নীচতা কেমন করে রয়েছে? খানিকক্ষণ আগে বিকেল বেলায় বসে বসে গলসওয়ার্দির 'ফরসাইথ সাগা' বইখানা পড়ছিলুম। তুমি যেটা আগের ডাকে পাঠিয়েছিলে। এক এক জায়গা এত সুন্দর যে, সারা মন উদাস করুণ হয়ে আসে। ঠিক সেই সময়ে মায়ের কাছ থেকে ডাক এল নীচে গিয়ে কাজকর্ম দেখবার জন্যে।

মেয়েমানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা মতামতের কোনই মূল্য নেই। তার ভাল লাগা বা না-লাগাকে কে-ই বা গ্রাহ্য করে? তাই বইখানার ভিতর সমস্ত মনটা ডুবে থাকতে চাইলেও জোর করে উঠে পড়ে নীচে গেলাম। আমার যথাশক্তি আমি তোমাদের বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম দেখা-শোনা করবার চেষ্টা করি। যতীনবাবুকে খাবার দেবার জন্য মা বলেছিলেন, তাতে তিনি আমাকে এমনই শ্লেষ করতে লাগলেন বিনা কারণে যে, আমার মনে বড়ই কষ্ট হ'ল। আমি বলে ফেললাম, আমাকে এমন করে অপমান করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?

'হয় ত আমার কষ্ট পেলেও নীরবে সহ্য করা উচিত, হয় ত আমার ও-কথাটা বলা অন্যায় হয়েছিল। যদি তোমার মা আমাকে তার জন্য ক্ষমা চাইতে বলতেন, আমি অসঙ্কোচে ক্ষমা চাইতাম। কিন্তু তিনি আমাকে এমন করে বকলেন যে, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'তোমার বাপ-মা বা তোমার স্বামীকে লিখে দাও যেন তোমাকে এসে নিয়ে যান।' এ-কথার পরে আর আমি এখানে থাকতে চাই নে। তোমাকে আর কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না, তোমাকে এসব নালিশ অভিযোগ শোনাতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়; কিন্তু যেখানে আমার মানবাত্মার অপমান সেখানে মুক্তির জন্যে তোমাকে আহ্বান না করেও পারি না।'

১৩

রাত্রির অন্ধকার সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছে। আকাশে চাঁদ নাই, নক্ষত্রের আলোক নিমেষহীন। হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে একটা চেয়ারে বসিয়া সুধীর আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। তাহার নাইট-ডিউটি পড়িয়াছে, ঘুমাইবার জো নাই এবং ঘুমের

বৃত্তিও নাই। মনের ভিতর তাহার আনন্দ ও বেদনার একটা সংঘাত
লিতেছে। সুমিত্রার চিঠিখানা সে কাল সকালে পাইয়াছে। বাড়ীতে
াহার কষ্ট হইতেছে, মায়ের সঙ্গে বনি বনাও হইতেছে না। ইহাতে
শান্তি হয় মনে। কিন্তু পৃথিবীতে সকলপ্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের
রুদ্ধে সে যে একমাত্র তাহারই কাছে নালিশ জানায়, সমস্ত অসম্মান
তে মুক্তির জন্য তাহাকেই আহ্বান করে, একথাটা স্মরণ হইবামাত্র
কটা তীব্র আনন্দের বিদ্যুৎ মনের মধ্যে খেলিয়া যায়। তবুও এ সমস্যার
ারে ভিতরে ভিতরে তাহার মন পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। বিবাহের
ক পরেই যে তাহাকে এমন একটা দ্বন্দ্বের মাঝে পড়িতে হইবে—ইহা সে
তাশা করে নাই। এই রকম দোটানার মাঝে পড়িয়া অবশেষে সে
ন তিনেকের জন্য ছুটি লইয়া বাড়ীতে গেল। বাড়ী আসার কোনই কথা
ল না। হঠাৎ বাড়ী আসিয়া দেখিল, মায়ের মুখ গম্ভীর। তিনি
লিলেন, 'আসবি, সে ত জানতাম। তবে পরীক্ষার বছর সেটা খেয়াল
াখিস। সামনে অমাবস্যা আর প্রতিপদ এই দু'টো দিন বাদ দিয়ে
লেই পারতিস। সত্যিই আর কিছু ঘরের বৌকে ভর্তি অমাবস্যায় ঘর
থকে যেতে দেওয়া হয় না। তা যখন এসেছিস, দিনকতক কামাই হবে।
াতিপদ গেলে একেবারে ওকে নিয়েই যাবি।'

সুধীর মায়ের কথা শুনিয়া আহত হইল। সে যে শুধু সুমিত্রাকে লইতেই
াসিয়াছে, এমন কথা মা কি করিয়া প্রশ্ন না করিয়া, জিজ্ঞাসা না করিয়া
াগে হইতেই আন্দাজ করিলেন? বাড়ী আসামাত্র এই সম্ভাষণ! দীর্ঘ
ন পরে ছেলে প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিলে এ কথা ছাড়া অন্য কথা কি
াহাকে বলা চলিত না?

সেও গম্ভীর হইয়া জবাব দিল। মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল, 'মনে
রেছিলাম তুমি কিছুতেই সাধারণ মায়ের মত নও। আমাকে যেমন

ভালবাস, আর একজনকেও তেমনই ভালবেসে কাছে টেনে নেবে। কিন্তু দেখতে পেলাম, পরীক্ষার ক্ষেত্র এলে সাধারণ অসাধারণ সব মেয়েই এক হয়ে যায়। সেখানে আর কোন তফাৎ থাকে না।'

মনোরমা কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া নতমুখে কহিলেন, 'হয় ত তাই হয়। তুমি ঠিকই বুঝেছ।'

কিন্তু মায়ের সঙ্গে যেমন কেবল মান-অভিমানের উপর দিয়াই গেল, আর একটা ক্ষেত্রে সেরূপ হইল না। সুধীরের পিতা ব্রজনাথবাবু অত্যন্ত কম কথা বলেন, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের লোক। তিনি কোর্টে বাহির হইবার সময় কহিলেন, 'সুধীর, দেখছি তুমি বিয়ের পর থেকেই একটা অশান্তিতে পড়ে গেছ, এতে আমি বড় দুঃখ পেয়েছি। এমন জানলে হয় ত আমি তোমার বিয়েই দিতাম না।' পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে এতে তোমার; সবই বুঝতে পারছি। বৌমা যেতে চাচ্ছেন, তাঁকে নিয়ে যাও। কিন্তু এ বাড়ীতে যখন তাঁর কষ্ট হয় তখন এখানে আর তাঁকে আসতে হবে না। অন্তত আমি নিজে থেকে আর আনতে চাইব না।

ব্যাপার দেখিয়া যতীন ভয় পাইয়া গিয়াছিল। বাঙালী ঘরের কোন মেয়েই যে সামান্য একটা তুচ্ছ ব্যাপার হইতে এতখানি করিয়া তুলিতে পারে—এ তাহার ধারণার অতীত ছিল। সুধীরকে একান্তে ডাকিয়া কহিল, 'আঃ—সুধীর, তুমি কি যে করছ আমি মাথামুণ্ড বুঝতে পারছি নে। তোমরা আজকালকার ছেলেরা ভাব-প্রবণতায় যে সকলকে ছাপিয়ে গেলে! এ যে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছ হে! নাও নাও ভাই, এসব মিটিয়ে নেও। এই ক'দিনে সমস্ত বাড়ীর হাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছে, ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই।'

সুধীর বলিল, 'তুমি জান না যতীন, ওর মনে খুব আঘাত লেগেছে।'

যতীন কহিল, 'কার কথা বলছ, বৌদির? মাপ কর ভাই, মেয়ে-

াহ্নষের যদি এইটুকু সহ্যগুণও না থাকে,তবে তিনি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছেন কন ? তোমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি নে। এমন সামান্য কারণে যদি একটা শান্তির পরিবারে এমন একটা বিদারণ-রখা পড়ে যায় তাতে বৌদিকে আমি কিছুতেই বাহবা দিতে পারব না।

সুধীরের নিজের মনেও কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম বেদনা কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল, যাহাকে শান্তির আশায় জীবনে বরণ করিয়া আনিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে একটা ক্রমবর্দ্ধমান অভিযোগ মাথা তুলিতেছিল। কিন্তু তীনের কথায় তাহার তর্কের রোখ চড়িয়া উঠিল। সে বলিল, 'ওটা ুমি ভুল বুঝছ, আজকালকার শিক্ষা আমাদের আত্মসম্ভ্রম এবং ব্যক্তিত্ব-বাধকে ক্রমশঃ অতি সচেতন করে তুলছে। এটা যে নিছক মন্দের জন্যই া আমি বলি নে। সবারই সন্তোষের জন্য নিজের মান অপমান বোধ একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হবে, এত বড় প্রত্যাশা আমি কিছুতেই ওঁর াছে করতে পারি নে। তাই ওঁকে আমি ভুল বুঝে তোমাদের মত অবিচারও করতে পারব না।'

যতীন কিছুক্ষণ অবাক হইয়া সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'কি জানি ভাই, তোমাদের আজকালকার শিক্ষা কি, কতই বা তার র্য্যাদা, কিন্তু এই যদি তার স্বরূপ হয়, তা হ'লে ওর প্রতি আমার কিছুমাত্র দ্ধা নেই। নিজের সামান্য অভিমান বা ক্লেশকে ফুলিয়ে বেলুনের মত ফুলিয়ে একটা গোটা সংসারের শান্তিকে আচ্ছন্ন করে দেওয়াই যদি তার ল হয়, তবে সে ফলের উপর আমার একটুও লোভ নেই।'

সুধীর রাগিয়া উঠিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমার শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধায় আমার কিছুই এসে যায় না। আমার নিজেরও কটা বিচার বুদ্ধি আছে। মেয়েমানুষ যে চিরকাল উৎপীড়িত হয়ে াসিবে এবং চোখমুখ বুজে নির্ব্বিচারে সব সহ্য করবে—এমন বিধির

কোন মানে হয় না। চিরদিন ধরে একটা নিয়ম চলে এসেছে বলেই যে সে নিয়মটা অত্যন্ত চমৎকার—একথা অনেকে একসঙ্গে মিলে তারস্বরে ঘোষণা করলেও সেটা সত্য হয়ে ওঠে না।'

পাশের ঘরে দেখা মিলিল, সুমিত্রার। রোদনস্ফীত কাতর দুই চক্ষুর মর্ম্মভেদী সজলবাণ নিক্ষেপ করিয়া সে কহিল, 'মিথ্যে কেন তুমি যতীন-বাবুর সঙ্গে তর্ক করে মরছিলে! তুমি কি জান না, আমার উপর আক্রোশ ওরই সকলের চেয়ে বেশী।'

অনেক দিন পরে সুমিত্রার সঙ্গে প্রথম এই দেখায় মনের ভিতরটা সুধীরের উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহারই সহিত মেশামিশি হইয়া একটা শ্রান্তি এবং হতাশার ভাবও ছিল। প্রিয়তমার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিবার সলজ্জ সুখ, সে আনন্দের নিঃশঙ্কতা, সে আনন্দের সম্ভ্রম যেন ধূলায় চূর্ণ হইয়া গেছে। অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা পড়িয়াছিল, ঠিক মনে নাই লাইনগুলা, অস্পষ্ট গানের সুরের মত মনের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছিল—

"ভিক্ষা, ভিক্ষা সব ঠাঁই
বল তবে কোথা যাই
ভিখারিণী হ'ল যদি কমল-আসনা।"

সুমিত্রা দৃপ্তভঙ্গীতে তখন বলিয়া চলিয়াছে, 'তা ছাড়া তর্কই বা কিসের জন্যে। এখানে আমি থাকতে পারছি নে, আমার ভাল লাগছে না। এর উপর আর কথা কি আছে? এইবার গ্রীষ্মের বন্ধের পরে সমস্ত কলেজ খুলবে, তখন আমি গিয়ে বি-এ তে ভর্ত্তি হব। আর্ট আর সায়েন্স কম্বিনেশন নেব, তাও আমি অনেক দিন থেকে ভেবে ঠিক করে রেখেছি। তুমি বলেছিলে তোমার অমত নেই।'

কিছুক্ষণ পর আঙুল গুণিয়া হিসাব করিয়া কহিল, 'তুমি ফাইনেল ম-বি দিয়ে যখন বার হবে, তার তিনচার মাস পরেই আমারও বি-এ রীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। সে বেশ মজা হবে। দু'জনেরই ষ্টুডেন্ট টইক!'

সুধীর বলিল, 'তোমার বি-এ পরীক্ষা দেবার এত কি দায় তা ামি ঠিক বুঝতে পারি নে। আসলে জ্ঞান নিয়ে কথা, বাড়ীতে স কি তা হয় না? কলকাতা যেতে চাইছ চল, আমার কোন াপত্তি নেই।'

সুমিত্রা মুখ ভার করিয়া কহিল, 'কেন তুমি আগে যে বলেছিলে শ্চয় পড়তে দেবে, ও-সব তা হলে তোমার মুখের কথা। আসলে সব রুষমানুষই এক। কথাতেই তাদের যত উদারতা, কাজের বেলায় চ্ছু নয়।'

সুধীর উঠিয়া পড়িয়া বলিল, 'আর কথা থাক। সুমিত্রা, তোমার ন্যে আমি সবারই মনে ব্যথা দিলাম, তবুও তুমি কিছুই বুঝলে না! তোমার মতেই যখন সব চলেছে, তখন তোমার যা খুশী তা-ই কর।'

১৪

রাত্রি ন'টায় ট্রেন। সুমিত্রা সন্ধ্যার পর হইতেই তৈয়ারী হইয়া সিয়া আছে। তাহার এবারকার যাত্রা বিদ্রোহের যাত্রা। ভাবে ঙ্গীতে আচরণে সে কথাটা সে নিজেও এক নিমেষের জন্য ভোলে নাই, পরকেও ভুলিবার অবসর দেয় নাই। নন্দা আসিয়া খাইতে ডাকিল। মিত্রা গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, 'আমি খাব না। ট্রেনে রাত জাগতে । কিছু খেলে রাত জাগা যায় না। ভারি অস্বস্তি বোধ হয়। তুমি

বরঞ্চ তোমার দাদাবাবুকে শীগ্‌গীর খেয়ে নিয়ে তৈরী হতে বলো গে।
আটটা প্রায় বাজে, ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে।'

নন্দা অনেকদিনের ঝি, এসব তাহার আদৌ ভালো লাগিতেছিল না।
আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করিয়া সে প্রস্থান করিল।

ব্রজবাবু সেদিন ইচ্ছা করিয়া মক্কেলের ঘর হইতে ভিতরে আসিতে রাত দশটা বাজাইয়া ফেলিলেন। যতীন কোর্ট ফেরত বাড়ী না আসিয়া কোথায় যে উধাও হইয়া গেল, পাত্তা মিলিল না। মনোরমা অসময়ে শয়ন গৃহে ঢুকিলেন। কাদম্বিনী একটা কার্পেটের আসন লইয়া দীপের আলোকে আপন ঘরের একান্তে বসিয়া বুনিতে লাগিল।

সুধীরের মনের ভিতর ঝড় বহিতেছিল। আজ অবধি যেখানে গিয়াছে মায়ের পায়ের কাছে প্রণত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলি আগে লইয়াছে। ট্রেনের সময় হইয়া আসিয়াছে, হয় ত দ্বারের বাহিরে গাড়ীর গাড়োয়ান কতবার তাগাদা দিতেছে তখনও মনোরমা ছেলেকে এটা ওটা নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন। শেষে অনেক দেরীতে বিদায় দিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া চলন্ত ঘোড়ার গাড়ীর দিকে চাহিয়া আঁচলে ঘন ঘন চোখ মুছিয়াছেন। খোলা জানালা দিয়া সুধীরও যতক্ষণ দেখা যায় দ্বারবর্ত্তিনী মায়ের দিকে চাহিয়াছে। আজ তিনি যাইবার সময় একটা কথাও বলিলেন না। অভিমান তাঁহার যতটা হইয়াছিল, সুধীরের তাহার চতুর্গুণ হইল। সে দারোয়ান ও বেয়ারাকে দিয়া একটা গাড়ী আনাইয়া তাহাদেরই সাহায্যে সমস্ত জিনিসপত্র গাড়ীর মাথায় তুলিল। সুমিত্রাকে আহ্বান করিয়া বলিল, 'এসো। আর দেরী ক'র না। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।'

সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। চাকরবাকরগুলা অবধি সশঙ্কিত হইয়া চলিতেছে। ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে।

বিদায় দিতে কেহ অগ্রসর হইয়া আসিল না। সুমিত্রার ভাই

লর জুতোটা বড় বেশি খট্ খট্ শব্দ করিল। স্বামীর পিছনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বসিয়া বলিল, 'তুমি খেলে না? এখনও ত
য় আছে। আটটা বাজতে পনেরো।'

, গাড়ীর ভিতরে অন্ধকার। কোন উত্তর না দিয়া সুধীর অন্ধকারে চুপ
রিয়া বসিয়া রহিল। কোন এক সময় চমক ভাঙিয়া বলিল, 'থাক
যে। না হয় ওয়েটিং রুমেই যেয়ে বসে থাকব।'

সুমিত্রার মনের সুর যে সুরে বাঁধা ছিল এ কথায় তাহাতেই আঘাত
ড়িল। সে বলিল, 'নিশ্চয়। ও বাড়ীতে আর এক মিনিটও থাকতে
চ্ছে করে না। তার চেয়ে ওয়েটিং রুমে বসে থাকা ঢের ভালো।'

সেই অন্ধকারের মধ্যেই সুধীর তাহার একটা হাত আপন হাতে তুলিয়া
ইল। মনে হইল সংসারের সবাই তাহাদের ত্যাগ করিয়াছে, নির্মম
ইয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে কেবল দু'জনে দু'জনার অবলম্বন। আর
কহ কোথাও নাই।

সেদিন ট্রেনে তেমন ভিড় ছিল না। সেকেণ্ড ক্লাস যে কম্পার্ট-
মণ্ট টায় তাহারা উঠিল সেটা একেবারে খালি। ট্রেন হু হু করিয়া
টিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে রাত্রির স্তব্ধতা চিরিয়া ইঞ্জিনের হুইসিল্
াড়িয়া উঠিতেছে। রাত্রিটা সুধীরের কাছে বড় অদ্ভুত লাগিতেছিল।
তদিন যে সুস্পষ্ট উপকূল দিয়া জীবনস্রোত বহিয়া যাইতেছিল আজ তাহা
্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ অজানা কোন এক পথে যাত্রা করিয়াছে। কে জানে
এ যাত্রায় কি আছে, কোথায় ইহার শেষ। মনের একদিকটা বেদনায়
ন টন করিতেছে কিন্তু সে বেদনার ক্ষতিপূরণ আছে যখন সুমিত্রার
দিকে চাহিয়া মনে হইতেছে একমাত্র তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সেও সব
ছাড়িয়া আসিয়াছে। যা কিছু তাহার অন্যায় বোধ হইতেছে তাহার
াগপাশ হইতে ছাড়া পাইবার জন্য সুধীরের সাহায্যই সে প্রার্থনা

করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটা সে প্রায়ই পড়িত, তাহারই কয়েকটি লাইন সে জোরে জোরে সুমিত্রাকে শুনাইতে লাগিল—

"এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে
এর কোন কূল আছে ? সৌন্দর্য্য পাথারে
যে বেদনা-বায়ু ভরে ছুটে মনতরী
সে বাতাসে, কতবার শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল।
অভয় আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই। বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে, আছে এক মহা উপকূল,
এই সৌন্দর্য্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ॥"

১৫

কিন্তু রাত্রির আলোয় কবির ছন্দোবন্ধনের সাহায্যে যে বেদনাকে সৌন্দর্য্যময় আবেগময়রূপে অনুভব করা গিয়াছিল দিনের আলোয় রূঢ় বাস্তবের মাঝে তাহার আর এক দিকটা প্রতিভাত হইতে লাগিল। ট্রেন ছাড়িয়া তাহারা তখন ষ্টীমার ধরিয়াছে। বেলা হইয়া গেছে। স্নানের ঘরে মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সুমিত্রা চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

কাল রাত্রিবেলায় তাহারা কেহই খায় নাই। তবু এই সকালে রান্নাবান্নার হাঙ্গাম করিতে তাহার ভাল লাগিল না। সময় যদিও যথেষ্ট ছিল কিন্তু ওসব ঝঞ্ঝাট কোনদিনই সে পোহাইতে ভাল বাসে না। অভ্যাসও নাই, ভালও লাগে না। তার উপর আজ মন নানা কারণে চঞ্চল হইয়া আছে। সুধীর চা রুটি প্রভৃতির অর্ডার দিয়া আসিল। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহারা কলিকাতায় পৌছাইবে। সুমিত্রার মনের ভাবনার ধারাটা এখন আর এক পথ ধরিয়া চলিতেছে। কাল পর্য্যন্ত স্বামীর বাড়ীতে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার অভিমান এবং অপমানবোধের পালাটা কেবলই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। আজ কিন্তু ভাবিতেছিল কলিকাতায় বাপের বাড়ীতে পৌছিলে তাঁহারা কি ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিবেন। যাইবার কথা ছিল না। হঠাৎ এমন করিয়া যাইয়া পড়িলে, কি মনে করিবেন। মনের একটা দিক সদম্ভে বলিতে লাগিল, যা খুসী মনে করুন, সত্য কথা বলিতে সে কাহারও মনে করা-করিকে ভয় করে না। যাহা সে অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছে তাহা কখনোই কোন কথার খাতিরে বা মতের খাতিরে সহ্য করিবে না।

একটা খানসামার হাতে ট্রেতে চা, কেক বিস্কুট পাঁউরুটি পাঠাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে সুধীর আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। সুমিত্রা দু'একবার ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, 'আচ্ছা, কলকাতায় একটা টেলিগ্রাম করে দিলে হ'ত না?'

সুধীর বলিল, 'আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ত আমরা যেয়ে পৌছব। এখন আর টেলিগ্রাম করার মানে কি?'

স্ত্রী একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, 'আঃ, বুঝতে পারছ না, এরকম ভাবে হঠাৎ যেয়ে পড়লে হয় ত ওঁরা কিছু মনে করতে পারেন। টেলিগ্রাম করা থাকলে সেদিক দিয়ে কিছু ভাববার থাকবে না।'

বলিবার ইচ্ছা না থাকিলেও সুধীর বলিয়া বসিল, 'কেন সুমিত্রা, কাল রাত্রি অবধি ত তুমি কে কি মনে করবে সে দিকটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করেচ। আজ হঠাৎ মত বদলে যাচ্ছে কেন?'

সুমিত্রা রাগিয়া কহিল, 'মত আমার কিছুই বদলায় নাই। ঠিকই আছে। তুমি এ সব ব্যাপারের কিছু বোঝ না। কথা বলতে এস না। কে কি বলবে তাই ভেবে যেন আমার ঘুম হচ্চে না, সে জন্যে আমি টেলিগ্রাম করতে বলি নি। তবে হঠাৎ গেলে যদি ওঁরা ভয় পান তাই মনে করে বলেছিলুম। যাক, তুমি যখন ও সব বুঝবে না তখন তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা।'

সুধীরও শুষ্ক স্বরে কহিল, 'আমারও বুঝবার দরকার নেই। আমার উপর শুধু ভার রয়েছে তোমাকে পৌঁছে দেবার। তোমাকে তোমার বাপের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েই আমি আমার হোষ্টেলে ফিরে যাব। তার পর যার সঙ্গে যা বোঝাপড়া করতে হয় তুমি ক'র।'

সুমিত্রা তখন মুখ অন্ধকার করিয়া খাবারের ট্রেটার পানে চাহিয়া বলিল, 'একি, এত সব তোমাকে কে আনতে বলেছিল? আমার ওসব কিছুই দরকার নেই। এক পেয়ালা চা হলেই কেবল হবে।'

১৬

সুমিত্রার মা বিরজাসুন্দরী স্বামীকে তাড়া দিয়া বলিলেন, 'ওগো কতদিন থেকে তোমাকে বলছি সুমিত্রার শ্বশুর বাড়ীতে ব্রজবাবুকে একখানা চিঠি লেখ, সুমিত্রাকে যেন একবার অন্তত: দিনকতকের জন্যেও পাঠিয়ে দেয়, তা তোমার অবসর হচ্চে না। এই প্রথম বিয়ের পর সেই যে গেছে কতদিন হয়ে গেল।'

সুমিত্রার পিতা স্নানাহার সারিয়া কলেজে পড়াইতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক। স্ত্রীর কথা শুনিয়া খেয়াল হওয়াতে বলিলেন, 'ঐ যাঃ,তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, ব্রজবাবুকে আমি লিখেছিলাম যে। তাঁর জবাবও আজ দিন তিনেক হ'ল এসেচে। এই যে চিঠিখানা আমার কোটের পকেটেই আছে। তিনি লিখেচেন, সুমিত্রা গেলে তাঁদের বড়ই কষ্ট হবে। সেই এখন বাড়ীর গৃহিণী বলতে গেলে। যদি নিতান্তই দেখবার ইচ্ছা হয় গরমটা একটু কমলে দিন পনেরোর জন্যে পাঠিয়ে দেবেন একবার।'

বিরজা চোখে জল মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন, 'ওসব বুড়োর ছল বুঝলে না! কলকাতা সহরে আবার গরমটা বেশী কোনখানটায়। সে যাই হোক এখন দেখচি তোমার কথাই সত্যি। বাস্তবিক সুমিত্রার জন্যে আমার মনে খুব ভাবনা ছিল। মেয়েকে ছোট থেকে কেবল লেখা-পড়াই শিখিয়েছিলে। ভাবতুম কি করে শ্বশুরঘর করবে। এখন দেখচি শ্বশুর বাড়ীতে দু'দিনে নিজের গুণে সবাইকে বশ করে নিয়েছে। এখন আর তাকে কেউ চোখের আড়াল করতে পারে না।' বিরজা বলিতে বলিতে স্নেহভরে সুমিত্রাকে মনে পড়িয়া ছল ছল চোখে চুপ করিলেন। তাঁহার স্বামীও সগর্ব্বে সে কথায় সায় দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। মোটর অনেকক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতেছিল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই মোটঘাট মাথায় লইয়া সুধীর ও সুমিত্রার গাড়ীখানা দরজায় দাঁড়াইল। বিরজা খবর পাইয়া পাংশুমুখে ছুটিয়া আসিলেন। কিছু বিপদ আপদ হয় নাই ত? এই দু'তিনদিন আগে বেয়াই লিখিয়াছেন, এখন সুমিত্রার আসা হইবে না। গাড়ীতে আসিতে আসিতে ঠিক এই মুহূর্ত্তের কথা সুমিত্রা অনেকবার অনেকভাবে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে। সুধীরকে একবার সে বলিয়াছে, 'আমার এক বুড়ী পিসীমা

আছেন, সেকেলে। তিনি যে কি বলবেন, হয় ত অষ্টপ্রহর আমার পিছনে লেগে আমাকে উত্যক্ত করে তুলবেন। শুনেছিলাম তাঁর কাশী যাওয়ার কথা আছে, গেছেন কি না কে জানে?'

সুধীরের মনটা বিকল হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে সুমিত্রার মুখে যে সব বড় বড় আদর্শবাদের বাণী শোনা গিয়াছিল। যে মহিমময় লাবণ্যে তাহার অভিমান, তাহার বিদ্রোহ তাহার অসহিষ্ণুতা সমস্তই রাঙিয়া উঠিয়াছিল সে জ্যোতির্লেখা কখন মিলাইয়া গেছে। এখন কেবল কথা উঠিতেছে, মা বাবা কি মনে করিবেন, টেলিগ্রাম করা উচিত ছিল কি না। বুড়ী পিসীমা কাশী গিয়াছেন না তীক্ষ্ণ শ্যেন্ দৃষ্টি লইয়া প্রহরা দিতে রহিয়া গেছেন!

সুধীর বিরক্ত হইয়া বলিয়াছে, 'এখন ত তোমার নিজের বাড়ীতে যাচ্ছ। কি বলতে হবে কি করতে হবে নিজের কর্ত্তব্য নিজে ভেবে ঠিক করে নিও। আমাকে দরজা থেকে বিদায় দিও।' প্রত্যুত্তরে সুমিত্রা কণ্ঠস্বরে মিনতি এবং অভিমান মিশাইয়া অনির্ব্বচনীয় সুরে বলিয়াছে, 'বা রে, তুমি সঙ্গে না থাকলে আমার ত আরও মুস্কিল হবে। অন্ততঃ এ বেলাটা তোমাকে আমাদের বাড়ীতে থাকতেই হবে।'

বিরজা মেয়েকে যখন ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিতেছিলেন, 'এমন হঠাৎ কেন আসা হ'ল রে সুমি? কিছু হয় নি ত? সবাই বেশ ভাল আছেন ত সুধীর?'

এবং সুধীর বিপন্ন হইয়া কি বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখন সুমিত্রা মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, 'বাপের বাড়ী আসব তার আর সময় অসময় কি। হাঁ, সবাই বেশ ভাল আছেন। হয় নি কিছু। উনি আসবার কথা লিখে একটা টেলিগ্রাম করে দিতে চেয়েছিলেন, আমিই বারণ করলুম। ভেবেছিলুম তোমাদের অবাক করে দেব।'

বিরজা কহিলেন, 'তোর শ্বশুর শাশুড়ী খুব ভাল লোক। কিছুদিন আগে উনি পাঠাতে লিখেছিলেন, তাই বোধ হয় শেষটায় পাঠিয়েই দিলেন। তাই জন্তেই বুঝি সুধীর, বাবা তুমি বাড়ী গিয়েছিলে ?'

সুধীর নতমুখে দ্বিধাভরে কোনরূপে কহিল, 'না, আজ্ঞে হাঁ, তা অনেকটা তাই বোধ হয়।'

বিরজা আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যা জামাতার স্নান এবং আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্ত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। একটা চেয়ারে বসিয়া সুধীর ঘামিতে লাগিল। এক সময় মুখ তুলিয়া স্ত্রীকে বলিল, 'কেন তুমি তোমার মাকে সত্যি কথা বলে দাও না যে, মা বাবা ইচ্ছে করে তোমাকে পাঠান নি। ওঁদের অন্যায় ব্যবহারে অপমানিত বোধ করে তুমি জোর করে চলে এসেছ। এখন আর যাবে না। যাবার ইচ্ছা কিংবা কল্পনা কোনটাই নেই।'

সুমিত্রা কি যেন ভাবিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 'নিশ্চয় ব'লব। আমি কি ভয় করি না কি সত্য বলতে !'

১৭

ক্রমশঃ কথাটা আর চাপা রহিল না। সুমিত্রা'র মা বিরজাসুন্দরী এ সকল একেবারেই পছন্দ করেন না। মেয়ে যে বিয়ের আগের দিন অবধি কলেজে গিয়াছে সে কেবল তাঁহার স্বামীর জিদে। এ লইয়া স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন তাঁহার অনেক তর্ক অনেক মতভেদ হইয়াছে। কিন্তু বিয়ের পরে সুমিত্রা যে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে বেশ মানাইয়া লইয়াছে, সকলের স্নেহের পাত্রী হইয়াছে, এই আনন্দে তিনি সমস্ত মতভেদ ভুলিয়াছিলেন ও স্বামীকে প্রায়ই বলিতেন, 'তোমার কথাই

ঠিক, তুমি খুবই বুদ্ধিমতী—যেথানে যে অবস্থায় পড়বে সে ঠিক মানিয়ে নেবে।'

এখন তাহার ঠিক উল্টা আবিষ্কার করিয়া তিনি বিস্ময়ে-বিতৃষ্ণায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

সেদিন বর্ষার আগে গরম কাপড়গুলা রোদে দিতে দিতে তিনি সাহায্যকারিণী কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'প্রায় একমাস হতে চল্‌ল, কই তোর শাশুড়ী একখানা পত্র দিলেন না? তুই চিঠি দিয়েছিলি ত?'

সুমিত্রা বলিল, 'না আমি দিই নাই, তাই হয় ত দেন নাই। তা ছাড়া তাঁর শরীর থারাপ, বারোমাসই প্রায় নীচে নামতে পারেন না। নিজের শরীর নিয়েই শশব্যস্ত।'

বিরজা অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া কহিলেন, 'ওমা অবাক করলি তুমি, একমাস এসেছিস, একখানা চিঠি দিয়ে রোগা শাশুড়ীর খোঁজ নিস্ নাই! এসবও কি এতবড় মেয়েকে শেখাতে হয়? আর তোর ননদ? যে ননদ ওথানেই থাকে, তার সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছে ত?'

'মোটেই না।' একটা অলেষ্টার রোদে মেলিয়া দিতে দিতে সুমিত্রা কহিল, 'সে যেমন নীচ, তেমনই হিংসুকে। আমি যখন ওথানে থাকতুম তার সঙ্গে সমস্ত দিনে দু'টো চারটের বেশী হয় ত কথাই হ'ত না।'

সুমিত্রার মা বিস্ফারিত নেত্রে মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুমিত্রা বেপরোয়াভাবে বলিয়া চলিল, 'তা ছাড়া এখন শীগ্‌গির আমি আর ওথানে যাচ্ছি নে। থার্ড ইয়ার পর্যান্ত পড়েছি, বি-এ পরীক্ষাটা দেব না কেন? এতে ওঁর মত রয়েছে।'

বিরজা বলিলেন, 'শুধু সুধীরের মত থাকলে চলবে না, তার বাপ-মায়ের মত চাই।'

'মানে আমার শ্বশুর শাশুড়ীর? না, তাঁদের মত নেই এতে।

ওঁদের সেকেলের মতে মেয়েমানুষের বেশী লেখাপড়া শেখার কোনই দরকার নেই, যা শিখেছি এই যথেষ্ট। বিয়ে হলেই মেয়েমানুষে শ্বশুর-বাড়ীতে থাকবে, ঘরকন্নার কাজ করবে, এর চেয়ে অন্য রকম তাঁরা সইতে পারেন না। তা বলে তাঁদের কথা অনুসারেই যে সংসার চলবে এমন কোন লেখাপড়া নেই।'

বিরজা অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, 'সুমিত্রা, অমন করে বলিস নে, কেন ওঁরা মন্দ কি বলেছেন? বিয়ে হলেই মেয়েমানুষের জীবনে অনেক কর্ত্তব্য অনেক নূতন দায়িত্বের ভার নিতে হয়। তোর যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, বয়স হয়েছে, যদি তুই সে সব কর্ত্তব্যের দায়িত্ব নিতে তৈরী ছিলি নে, কেন তোর বাবার কাছে বলিস নি যে, আমি এখন বিয়ে করব না। বিয়ে না করে কলেজে পড়লেই পারতিস। আমি সেকেলে অশিক্ষিতা; আমি সোজাসুজি বুঝি। যখন যে জীবনে ঢুকতে হবে, তখন সেটাকেই প্রাণপণে সার্থক করে তুলতে হবে। এখন বিবাহিত জীবনের নানা কর্ত্তব্য নিয়ে তুই যদি সে সব অবহেলা করে কলেজে পড়ব, নিজের মতে চলব—এই সব করিস, সেটা খুবই অন্যায় করা হবে।'

সুমিত্রা অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, 'কেন, এখন ত ওঁর পাশ করে বার হতে প্রায় বছর দেড়েক দেরী। তারপরে হয় চাকরী করবেন, না হয় ত প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন। নিজের সংসার পেতে বসতে এখন ত বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়টা নষ্ট না করে আমি কাজে লাগাতে পারি। ততদিন আমার বি-এ পাশ হয়ে যাবে।'

যুক্তির পরে যদি মেয়েকে ঠিক রাস্তা দেখাইয়া দিতে পারেন এই আশায় বিরজা কহিলেন, 'আচ্ছা না হয় মানলুম তোরা আজকালকার মেয়ে নিজের স্বামী আর নিজের সংসারের বাইরে আর যে কোন কর্ত্তব্য আছে তা মানিস নে, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই একটা শিক্ষা-নবিশী করবার

সময় আছে। দেখিস নে, বড় বড় চাকরীতে অবধি ঢুকবার আগে একটা ট্রেনিং পীরিয়ড থাকে। তুই এই দু' বছর কেবল কলেজে পড়লি আর বই মুখে করে ব'সে রইলি, তারপর যখন নিজের সংসার পেতে বসবি, তখন তা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে চালাবি কেমন করে? কিছুই ত জানবি নে। হয় ত ততদিনে মা হতে পারিস, মায়ের কর্ত্তব্য বা জানবার যা কিছু, সে সবই ত তোর অজানা থেকে যাবে। তখন দেখবি নিজের জীবনেই কেমন ঠকে গেছিস। তখন মনে হবে, যা করেছিস, যেপথে চলেছিস সেটা কত ভুল। তার চেয়ে যদি শাশুড়ীর কাছে পাঁচটা লোক-জনের সংসারে পরকে আপন করে মেয়েদের স্বাভাবিক-সুন্দর জীবন কাটিয়ে যাস, দেখবি জীবনের অভিজ্ঞতা কত বেড়ে গেছে। তখন আর নিজের স্বাধীন সংসার চালান কিছু শক্ত মনে হবে না।'

সুমিত্রা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'ভারি ত শেখা, পান সাজা কুটনো কোটা আর লুচি বেলা—এসব তুচ্ছ কাজ শিখতে হয় না। সংসারে চাকর থাকবে, ঝি থাকবে, রাঁধুনী থাকবে। তাদের কাজকর্ম্ম দেখা-শোনা আর একটু সব বিষয়ে তদারক করা। এ আর আগে থেকে আড়ম্বর করে শিখতে হয় না।'

নীচের তলায় সুধীরের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। চাকরটাকে সে প্রশ্ন করিতেছে, 'মা কোথায় গেলেন ভজুয়া?'

বিরজা তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিলেন, 'আজ কতদিন পরে সুধীর এসেছে, না খেয়ে আজ আর ওর যাওয়া হবে না। দেখিস সুমিত্রা, ও পালায় না যেন।'

সুধীর ততক্ষণে সিঁড়ি বাহিয়া উপরের ছাদে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার হাতে কি কতকগুলা কাগজপত্র। সুমিত্রার সামনে কাগজগুলা ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'এই নাও, কাগজগুলা রেখে দাও তোমার কলেজে

ভর্তি হওয়ার সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। তুমি বেথুন কলেজের পুরনো ছাত্রী, সহজেই সীট পাওয়া গেল। বাবাকে বলেছ ত? আজ তিনি ফিরে এলে না হয় ব'ল সব কথা। যদি না ব'লে থাক।'

বিরজা উত্তেজিত হইয়া সুধীরকে কহিলেন, 'তুমিও ওর এই সব অসঙ্গত খেয়ালের প্রশ্রয় দিচ্ছ বাবা? এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। তোমার বাবা-মায়ের কথা সকলের চেয়ে উপরে।'

সুধীর হাসিয়া পকেট হইতে একখানা খামের চিঠি বাহির করিয়া কহিল, 'ঐ ব্যবস্থায় পাছে আমার মা'র মনে কষ্ট হয় বা তাঁর অমতে কোন কাজ হয়, এ নিয়ে আমার মনে বরাবর একটা কষ্টের ও সংশয়ের ভাব ছিল। নইলে সুমিত্রার সঙ্গে আমার পূর্ণ সায় আছে। সে ত অন্যায় আব্দার কিছু করে নি, অযথা সময় নষ্ট না করে পড়াশোনা করতে চাচ্ছে মাত্র। কিন্তু কাল মায়ের এই চিঠিখানা পেয়ে আমার সেটুকু সংশয় আর নাই। তিনি সন্তুষ্ট হয়েই এতে মত দিয়েছেন।'

বিরজা চিঠিখানা হাতে লইয়া কহিলেন, 'তুমি বাবা যেন না খেয়ে পালিয়ে যেও না। সুমি, যা নীচে গিয়ে ওর স্নানের ব্যবস্থা করে দিয়ে আয়।'

'দেখি দেখি আমার শাশুড়ী কি লিখেছেন।' সুমিত্রা অধীর আগ্রহে চিঠিখানা মায়ের হাত হইতে লইল।

জামাইয়ের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে বিরজা নীচে নামিয়া গেলেন। চিঠিখানা খুলিয়া সুমিত্রা পড়িতে লাগিল। সুধীরের মা লিখিয়াছেন—

"প্রাণাধিকেষু,

"বাবা সুধীর, তোমার চিঠি পেলাম। বৌমা যদি এখন এখানে না আসিতে চান বা পড়াশোনা করিতে চান আমার তাহাতে কোন আপত্তি

নাই। আমি নিজের মতামত বা শাসন দিয়া তোমাদের জীবনকে কোন ভাবেই আচ্ছন্ন করিতে চাহি না। তোমরা জীবনের নূতন যাত্রাপথে বাহির হইয়াছ, যদি আমাদের কোন অভিজ্ঞতা কাজে লাগে, এই আশায় যা কিছু শিখাইতে গিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাদের জীবনে যদি সে পাথেয় সে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কাজে না লাগে, তবে তোমরা যে পথ বাছিয়া লইয়াছ তাহাতেই চল। হয় ত কালের প্রবাহ বদলাইয়া গিয়াছে, এখন পুরান দিনের অভিজ্ঞতা নূতন অনাগত দিনে আর কোন কাজেই লাগে না। তাহার জন্য নূতনভাবে প্রস্তুত হইতে হয়, নূতনতর শিক্ষার আবশ্যক হয়। সে যাই হোক, তোমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তোমরা দু'জনে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল বুঝিয়াছ সেই পথেই চলিবে, আমার কোন আপত্তি নাই। বৌমা যখনই এখানে আসিতে চাহিবেন, তাঁহার জন্য এ বাড়ীর দরজা সর্ব্বদা খোলাই থাকিবে। আশা করি, পড়াশোনা মন দিয়া করিতেছ। তোমরা আমার শুভাশীষ লইবে। মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ দিবে। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদিকা—তোমার মা।"

সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, 'তোমার মা আর যাই হন, আগেকার মেয়েদের মত অত সঙ্কীর্ণচিত্ত নন। তুমি বুঝি ওঁকে চিঠি দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি লিখেছিলাম, তুমি ত অন্যায় কিছু কর নাই, তবে ওঁরা অনর্থক কেন রাগ-অভিমান করছেন। সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতটা করবার কি দরকার।'

'যতীনবাবু অযাচিত হয়ে আর তোমাকে কোন পরামর্শ দেন নাই? আর তোমার বোন?' সুমিত্রা শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

সুধীর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে কহিল, 'তাদের কথা ছেড়ে দাও। তাদের সঙ্গে ত আর আমাদের সারাজীবনের সম্পর্ক নয়। মায়ের জন্যে আমার মনে একটা ক্লেশ ছিল, আজ তাঁর চিঠি পেয়ে সেটুকুও গেছে।'

সুমিত্রা সহাস্যে কহিল, 'বেশ আজকে তা হলে তোমার মন ভাল। ইখানেই নাওয়া খাওয়া সেরে যাবে। মা অনেক করে বলছিলেন।'

স্থধীর কহিল, 'তা যেতে পারি। আজ সমস্ত দিন তোমার কথা শুনে তে পারি, কারণ আজ কিসের একটা বন্ধে কলেজের ছুটি। কিন্তু শুধু াহারের দাবী ছাড়াও তোমার কাছে একটা দাবী আছে। অনেক দিন খানে আসি নাই, অনেক দিন তোমার গান শুনি নাই, আজ একটা ান করবে?'

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় ছাদে মাদুর পাতিয়া সুমিত্রা গায়িল—

"তোমার বাণী নয় গো শুধু হে বন্ধু হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, ছাদের টবের যুঁই এবং রজনীগন্ধার ারা হইতে প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধ আসিতেছে। সুধীর পার্শ্ববর্তিনীর দিকে াহিয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে কহিল, 'তোমার মুখে এ গান কেন সুমিত্রা? তামার কথা মনে হলেই মনে পড়ে, দৃপ্ত তেজস্বিনীর মুখ। নিজের র্তব্য, নিজের স্বাতন্ত্র্য তুমি দৃঢ়-বলিষ্ঠ হাতে বেছে নাও। এ গান ত তামার নয়।'

সুমিত্রা তাহার স্বামীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, 'তা কেন, তামার কাছে চিরদিনই আমার চাইবার আছে। সেখানে স্বাতন্ত্র্যের কান দামই নেই।'

কিন্তু এ কথা যে সুমিত্রার, সহসা সে কোন্ মাধবী রাত্রিতে তারার ালোয়, ফুলের গন্ধে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠে। সে জাগিয়া উঠা ্ষণকালের। তার পরেই জগতের কোলাহল-কলরবে কোথায় হারাইয়া ায়। সেখানকার তর্কের উত্তাপে আধুনিকতার অত্যুগ্র আলোকে সেই মেয়েটিকে আর চেনাই যায় না।

যাইবার সময় সুধীর বলিল, 'তোমার বাবাকে তা হলে ব'লে সব ঠিক্ করে রেখ। এই সামনের সোমবার থেকেই কলেজ যাচ্ছ ত? তোমার বইগুলা আমি কাল কিনে নিয়ে আসব।'

সুমিত্রার মায়ের মত তাহার বাবা কোন আপত্তি করিলেন না ইহাতে। তিনি নিজে কলেজের একজন খ্যাতনামা প্রফেসর। লেখাপড়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কাছে অত্যন্ত উচ্চস্তরের একটা জিনিস। সুমিত্রা যখন বলিল, 'আমি যে কলেজে গিয়ে অন্তত বি-এ টাও পাশ করি এতে ওঁর খুবই মত আছে। আর আমার শ্বশুরবাড়ীর কারোই অমত নেই। আজ আমার শাশুড়ী লিখেছেন যে, এতে তিনি অখুশীর পরিবর্তে খুশীই হবেন।'

তখন তিনিও সানন্দে ইহাতে রাজী হইলেন।

১৮

যখন সবারই বিরুদ্ধে লড়িয়া সুমিত্রা কলেজে পড়িবে এবং কলিকাতায় থাকিবে বলিয়া জিদ করিয়াছিল, তখন তাহার যতটা উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল এখন আর ততটা নাই। কিন্তু যখন এত চেষ্টা করিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছে, তখন অন্তত মেয়েদের মধ্যেও পরীক্ষার ফলটা যাহাতে শীর্ষ স্থান অধিকার করে সে চেষ্টা করিতে বাবা বলিয়াছেন; তাই এদিকে পারতপক্ষে কখনও সে অবহেলা করে না। সকাল বেলায় উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া এক পেয়ালা চা খাইয়া সে বই খাতাপত্র লইয়া বসে। আটটা নটার সময় বাবার ঘরে গিয়া তাঁহার কাছেও কিছুক্ষণের জন্ম পড়ে। তারপর স্নানাহার সারিয়া কলেজে যায়। বিকালের দিকে আগে ব্যাটমিন্টন খেলিত, এখন আর রোজ খেলা হইয়া ওঠে না কোনদিন সুধীরের চিঠির জবাব লিখিতে বসে, কোনদিন বান্ধবীদের বাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হয়। তাহার বন্ধুদের মধ্যে দীপ্তি

থানেক হইল বিবাহ হইয়াছে। স্বামী কলিকাতারই কোন একটা
লেজে প্রফেসরী করেন। আর সুমনার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু
নার স্বামী বড় ইঞ্জিনীয়ারিং চাকরী করেন, সে কলিকাতায় বড় একটা
সতে পায় না। ভবানীপুরে যখন তাহার সহিত দেখা করিতে
াছিল, তাহার পরেই সে স্বামীর কর্মস্থানে চলিয়া গিয়াছে। সেদিন
াদের বাড়ী বেড়াইতে যাইবে মনে করিয়া সে একেবারে কাপড়-চোপড়
ড়িয়া নীচে নামিয়া আসিল। সুধীরও তখন সেই মাত্র বাড়ী
তেছে। সুমিত্রা হাস্যকুল্ল মুখে বলিয়া উঠিল, 'বা রে, তুমি ঠিক
সই এসেছ, চল না একটু বেড়িয়ে আসি।'

'কোথা যাবে?'

'আমার এক বন্ধু, এক সঙ্গে কলেজে আই-এ অবধি পড়েছি। দীপা
র নাম, নতুন বিয়ে হয়েছে। সেদিন এসেছিল আমাদের বাড়ীতে।
র স্বামী কলেজে প্রফেসরী করেন, ভবানীপুরের ঐ দিকটায় যোগেশ
ন্দ্র রোডে তাদের বাড়ী। বাড়ী মানে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে
মী-স্ত্রী নতুন সংসার পেতেছে। চল না দেখে আসি! অনেকবার
র যেতে বলেছিল।'

সুধীর স্মিতমুখে হাসিয়া বলিল, 'নতুন পাতা সংসার দেখতে তোমার
আগ্রহ, কিন্তু তুমি ত সংসার পাততে চাও না! চাও স্বাধীন মুক্ত
জীব মত থাকতে—'

'আহা, তাই যেন তোমাকে আমি বলেছি—'

'অনেকটা—'

'অনেকটা কি বলেছি?'

'তার মানে সংসার পাততে গেলেই সুখে এবং দুঃখে তার দায়িত্ব
তে হয়। তুমি দায়িত্ব নিতে চাও না।'

'আচ্ছা তোমার দায়িত্ব নিতে চাই কি-না, সে জবাবের সময় আসুক তখন দেব।' একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া দু'জনে চড়িয়া বসিল।

দীপা তখন উনুনে আঁচ দিতেছিল। তাহাদের ছোট ফ্ল্যাটের সামনের ঘরখানি বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া বসিবার ঘর করা হইয়াছে। সেখানে একটা চেয়ারে সুধীর বসিল। কেহ কোথাও নাই। সুমিত্রা ভিতরে চলিয়া গেল। বসিবার ঘরের দুই পাশে দুইখানি ছোট শয়নকক্ষ। তারপরে ছোট একটুকরা বারান্দা ও তাহার উত্তর দিকে ছোট ছোট পায়রার খোপের মত তিনখানি ছোট ঘর—রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ও বাথরুম।

বারান্দাটা পার হইয়া রান্নাঘরের সুমুখে আসিয়া সুমিত্রা দেখিল, দীপা উনুনের উপর ঘুঁটে সাজাইয়া তাহাতে কেরোসিন তেল ঢালিতেছে। এমন অবস্থায় সুমিত্রার সহিত দেখা হওয়ায় দীপা একটু অপ্রস্তুত হইল, —'কে, সুমিত্রা বুঝি? এতদিন পরে মনে পড়ল? আমি যেদিন তোর ওখানে গিয়েছিলাম, তুই বললি শীগগির আসব, আমি রোজই অপেক্ষা করতাম আজ বুঝি আসবি। শেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। তুই ভাই ততক্ষণ বাইরের ঘরে একটু ব'স্। সঙ্গে কে এসেছেন? স্বামী এসেছেন বুঝি? ও মা, তিনি একাই বসে রয়েছেন। যা যা, আর একমিনিটও দেরী করিস নে, এ ত তোর বন্ধুর বাড়ী নয়, নিজের বাড়ী বলেই মনে করিস। তাই বন্ধুর হয়ে আতিথ্যের সাহায্য করবি, আমি এই কাজটা সেরে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছি।'

তাহার পর একটুখানি সলজ্জ কৈফিয়তের সুরে কহিল, 'ওঁর আসবার সময় হয়ে এল, কলকাতার ঠিকা ঝি গুলাকে জানিস ত সেই সন্ধ্যার আগে ছাড়া আসবে না, বলতে গেলে কথা শুনবে না, উল্টে কথা শোনাবে। তাই নিজেই রোজ উনুনে আঁচ দিয়ে নিই। নইলে ঠিক সময়ে এসে চা হয় ত পাবেন না।'

সুমিত্রা কহিল, 'এত কষ্ট করবার দরকার কি? ষ্টোভ ধরিয়ে চা রলেই ত পারিস। অনর্থক ধোঁয়ার কষ্ট পেতে হয় না।'

'ষ্টোভ ধরানোর অনেক হাঙ্গাম রে, কোথায় স্পীরিট, নিত্যি খারাপ ওয়া। আজ পোকার নেই, কাল পাম্প খারাপ হয়ে গেছে। তা াড়া খরচও বেশী—সে দিকটাও দেখতে হবে। আর উনুনটা ধরান াকলে অনেক সুবিধে হয়। ধর, চা হয়ে গেলে খাবার ক'রে নিলুম, ার পরে হয় ত তরকারীটা চড়িয়ে দিলুম।'

'তুই নিজে রান্না করিস নাকি?' সুমিত্রা অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল।

'বাঃ, নিজে করি না ত কি, এই দু'টি লোকের জন্তে আবার একটা বামুন রাখব না কি? ভারি ত কাজ। আর কলকাতার বামুন-গুলোর মাইনে কত, খুব কম পক্ষে দশটাকার ত কম নয়।'

সুমিত্রা বলিল, 'দীপা, আমার ভারি অবাক লাগছে ভাই! এই সেদিন তুই কলেজে হিষ্ট্রি আর লজিক মুখস্থ করতিস, এরই মধ্যে এত বদলে গেলি কেমন করে? ষ্টোভ জ্বালাতে গেলে বেশী খরচ হয়, বামুন না রেখে ঢের কম খরচে সংসার চালান যায়—এমন সব গুরুতর তথ্য এরই মধ্যে তোর মাথায় আনা-গোনা করছে!'

'যদি আস্ত একটি সংসারের ভার তোর মাথার উপর পড়ত, আর চোখের সুমুখে দেখতিস, স্বামী বেচারা উদয়াস্ত খাটুনি খাটছে টাকার জন্তে, তা হলে তোরও মগজে এই সব গুরুতর তথ্য ঘোরাফেরা করত। তখন হিষ্ট্রি, লজিক মুখস্থ করা কোথায় পড়ে থাকত! কিন্তু তুই যা না ভাই বাইরের ঘরে। ব'স্, আমি চললাম এখনই।'

'তার এত ব্যস্ত কেন, থাকুন না একটু একা বসে। ইতিমধ্যে তোর স্বামী নিশ্চয় এসে পড়বেন। কলেজ থেকে ফিরতে এত দেরী হয়?'

'একটি ছেলেকে ইনটারমিডিয়েট-সাগর উত্তীর্ণ করার ভার নিয়েছেন,

সেই অধমতারণের কাজের জন্যেই যেতে হয় কলেজের পরে। কলেজের কাছেই বাড়ীটা পড়ে। একবার ভবানীপুরে ফিরে এসে আবার যাওয়া অনেক হয়রানি।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই দীপার স্বামী অসীমবাবু আসিয়া পড়িলেন। চশমা-চোখে শ্যামবর্ণ ছিপছিপে সাধারণ চেহারা, সংসারে ন'শো নিরানব্বই জন বাঙালী যেমন হয় তেমনই কোথাও যে তাঁহার খুব একটা অসাধারণত্ব বা বিশেষত্ব আছে—সুমিত্রা তাহা বুঝিতে পারিল না। দীপার কথা অবশ্য আলাদা। সুমিত্রা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এঁরই সংসারের জন্য দীপা অবিশ্রান্ত খাটিতেছে, কেন, কিসের আকর্ষণে কে জানে?

তিনি সুধীরের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন, দীপা চা এবং লুচি তৈয়ারী করিতে করিতে সুমিত্রার সঙ্গে অনর্গল বকিয়া চলিল।

সুমিত্রা বলিল, 'তুই বড় সাধারণ হয়ে পড়েছিস দীপা। সেই নাইন্টি পার্সেণ্ট বাঙালী ঘরের মেয়ের মত হাঁড়িকুঁড়ি আর সংসারকে সার করলি। যেন এর বাইরে আর কিছুই নেই।'

দীপা কেট্‌লিতে চায়ের পাতা দিয়া গরম জল ঢালিতে ঢালিতে কহিল, 'আমিও একদিন তোমার মত নাইন্টি পার্সেণ্ট বাঙালী মেয়েকে বড় অনুকম্পার চোখে দেখতাম। কিন্তু এখন দেখছি, এই ছোট্ট সংসার আর হাঁড়িকুঁড়ি নাড়ার মধ্যেই যা ধরে তার তুলনা নেই। তুই একটা ভুল করেছিস সুমিত্রা, কলেজে একদিন পড়েছি বলেই রাঁধাবাড়া করতে নেই বা ঘরের কাজ কর্ম্ম করতে হ'লেই জীবনটা বড় সাধারণ, বড় নিম্নস্তরের হয়ে গেল, তা হবে কেন?'

'না না, তা আমি ঠিক বলি নি। তবে সর্ব্বদাই সংসারের ঘানিতে বাঁধা পড়েছিস। ইচ্ছা করলেও কোথাও যেতে পারিস নে, জীবনের উঁচু দিকের চিন্তায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারিস নে।'

'এটা তোর ভুল ধারণা সুমিত্রা। সারাদিন যাদের অবসর, সংসারের কোন ভাবনা, কোন চিন্তা, কোন কাজ নেই, যা না তাদের ওখানে গিয়ে দেখে আয় তারা উচ্চ চিন্তায় নিজেদের কত ব্যাপৃত রেখেছে। জীবনে কোন কাজ করব না, কোন দায়িত্ব নেব না, সে জীবনের মানে কি? এই দেখ না সকাল থেকে উঠে আমি অবসর পাই নে, কত কাজ। উনিও তাই। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যেতে দু'জনেরই কাজ শেষ হয়। তখনকার অবসরটুকু কি সুন্দর কি মূল্যবান যে মনে হয়। তখন আমরা প্রায়ই বেড়াতে যাই একসঙ্গে। কোন কোনদিন ছাদে গিয়ে বসি। কলকাতার আকাশে কোন বর্ণ-বৈচিত্র্য নেই, সমারোহ নেই। কিন্তু তবু সাধারণ ওই সূর্য্যাস্ত, তার পরে ক্রমশ দু'টি একটি তারা ফুটে ওঠা, এত ভাল লাগে। আমার ত ভাই মনে হয় সারাদিনের কাজের পরই বিশ্রামের অবসরটুকু এত দুর্ম্মূল্য, এত মিষ্টি লাগে। যদি সারাদিনই সোফায় বসে কাব্য পড়তাম হয় ত এত ভাল লাগত না, দু'দিনেই ক্লান্তি এসে যেত। দাঁড়া, কড়ার ঘী-টা গরম হয়ে গেছে, চট্ ক'রে খানকতক লুচি ভেজে নিই—তুই ততক্ষণ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দে না। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না—গল্প করতে করতে?'

১৯

আরও কিছুক্ষণ পর বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিবার পরে সুমিত্রা স্বামীকে প্রশ্ন করিল, 'কেমন লাগল?'

'চমৎকার ছোটখাট নিভৃত ঘরকন্না। তোমার বন্ধু ঐ দীপা মেয়েটিও ভারী সুন্দর। অযথা লজ্জা নেই, কিন্তু বেশ চমৎকার একটি শান্ত মর্য্যাদাশালিনীর ভাব।'

'হ্যাঁ, দীপাকে দেখে আমার অবাক লাগে। ওর বাবা খুব বড়লোক, সেক্রেটারিয়েটে বড় কাজ ক'রে পেন্সন পেয়েছেন। দীপা যাকে বিয়ে করেছে, সে ভদ্রলোক সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে। এই সবেমাত্র ভাল ক'রে এম-এ পাশ করে কোন একটা কলেজে প্রফেসরিতে ঢুকেছেন। ছেলেদের প্রাইভেটট্যুশনিও করেন। কিন্তু দেখছি, দীপা চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে। যেন এই রকম অল্প-আয়ের সংসারে সুশৃঙ্খল ক'রে সংসার চালাতে সে আজীবন অভ্যস্ত—এই কাজই ক'রে আসছে চিরকাল। অথচ তা ত নয়। ওকে বরাবরই দেখছি, বিয়ের আগে যখন ওর বাপের বাড়ীতে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম—'

সুধীর বাধা দিয়া কহিল 'বুঝেছি। ওর মত মেয়েদেরই ভালবেসে নিজের স্বাধীন বিচারে বিয়ে করা চলে।'

সুমিত্রা একটুখানি আহত হইয়া কহিল, 'আহা, আর কারও বুঝি চলে না! কেন, ওটা ত মেয়েদের জন্ম-স্বত্ব। যার সঙ্গে আজীবন সুখে-দুঃখে কাটাতে হবে, তাঁকে জেনে-শুনে ভালবেসে নেবে না?'

'আহা, ভুল বুঝছ কেন, ওটা ত আজকালকার বাঁধা-বুলি, 'লভম্যারেজ' ছাড়া আর কোন বিয়ে যেন বিয়েই নয়! কিন্তু 'লভম্যারেজ' করবার যোগ্যতা ক'জনের আছে?'

ঠিক বুঝলাম না।'

'ধর, অনেকদিন আগে—সেই পৌরাণিক যুগেও আমাদের একজন রাজকন্যা লভম্যারেজ করেছিলেন, কিন্তু—'

'কে সে রাজকন্যা?'

'বল দেখি, কেন তুমিও ত পড়েছ।'

একটু ভাবিয়া সুমিত্রা কহিল, 'কি জানি বাপু, তুমি দেখছি আজ বড় রোমান্টিক হয়ে পড়েছ।'

'সে রাজকন্যা হচ্ছেন সাবিত্রী। তিনি রাজার মেয়ে হয়েও একটিবারমাত্র দেখায়—সত্যবানকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু একবারও ভাবেন নাই যে, স্বামীর বাড়ী গিয়ে কাঠ কুড়োতে, ভাত রাঁধতে পারবেন কি না। কিন্তু সময় যখন এল, দেখা গেল সর্ব্ব অবস্থাতেই তাঁর প্রেম জয়ী হয়েছে। যদিও বাপের বাড়ীতে থাকতে কোনদিন এসব কাজের শিক্ষানবিশী করেন নাই, কিন্তু তাঁর মানসিক শক্তিতে সমস্ত অসম্ভবই সম্ভব হ'ল। আমার মতে, প্রেম একটা মানসিক শক্তি। আজকালকার মেয়েদের বেশীর ভাগ প্রেম করবার সখ আছে, কিন্তু মানসিক শক্তি নেই। তাই, সে প্রেম সত্য হয় না। তারা অহরহ হিসেব কষে—স্বামীর বাড়ীতে অর্থের অঙ্কটা কতদূর থাকবে। সেখানে মোটর চড়া, সিনেমা-দেখা এবং ফারকোট-কেনা অব্যাহত গতিতে চলবে কি-না। তা ছাড়া আরও কত সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে—'

সুমিত্রা বলিল, 'তুমি যে আজ লেকচার দিতে সুরু করলে—দীপাকে দেখে তোমার আজ উচ্ছ্বাস এসেছে।'

'না, উচ্ছ্বাস আসে নি সুমিত্রা ; কিন্তু তুমি বুঝবে কি-না জানি না, —মেয়েমানুষকে আর যে কোন অবস্থায় দেখি, তাকে গৃহকাজের মাঝে যত একান্ত সত্য এবং সার্থকভাবে দেখা যায়, এমন আর কিছুতেই নয়। এ বস্তুটা আমাদের এত আকর্ষণ করে—এই যে তোমাদের বাড়ী এসে গেছে। আচ্ছা আমি তা হলে আসি।'

'বাঃ, সে কি, তুমি বাড়ী ঢুকবে না নাকি! দিন দিন যেন 'পরস্যাপি পর' হয়ে যাচ্ছ!'

'না থাক, প্রায় আটটা বাজে। আর হোষ্টেলে যাবার সময় হয়ে গেছে। অন্যদিন বরঞ্চ আবার আসব।'

মোটরটা দাঁড়াইবামাত্র সুধীর নামিয়া অন্যমুখে চলিয়া গেল। সুমিত্রা একটু অভিমানের সহিত বাড়ীতে ঢুকিল।

কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া সে কলেজের বই—বোটানি, সিভিক্স লইয়া বসিল। কিন্তু বইয়ের পাতার মধ্যে মন কিছুতেই বসিতে চায় না! দীপার সেই ছোট্ট অনাড়ম্বর সংসারটীর চিত্র কেবলই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে! এতক্ষণ তাহারা কি করিতেছে? দীপার সমস্ত কাজ হয় ত সারা হইয়া গেল; তাহারা দুইজনে ছাদে একটী মাদুর পাতিয়া বসিল। মাথার উপর অন্ধকার, আকাশে তারার আলো কাঁপিতেছে। দীপার গৃহস্থালীর তুচ্ছ কাজ—সেই ময়দা মাখা, লুচি করা, ষ্টোভ ধরান, বিছানা করা সন্ধ্যা দেখান—ইহাদের অভিনবত্ব বা নূতনত্ব ত কিছুই নাই! কিন্তু তবু একজনকে সুখে রাখিবার, আরাম দিবার ঐকান্তিক প্রয়াসে এই ছোটখাট কাজগুলির ভিতর দিয়া নারী-হৃদয়ের সুষমা কেমন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে! এ সব কথা আজ হঠাৎ এমন করিয়া কেন মনে পড়িতেছে? এতদিন যা ভাবিয়া সুখ পাইয়াছে, আজ সে ভাবনার ধারাটা বদলাইয়া গেল কেন? বই রাখিয়া দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সুমিত্রা কতক্ষণ যে অন্যমনস্ক হইয়াছিল তাহার খেয়াল নাই। কিছুক্ষণ পরে চমকিয়া উঠিয়া আবার বইয়ের পাতায় চক্ষু নিবদ্ধ করিল—ছি, ছি, এই সব ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় সে তাহার চিরদিনের সঙ্কল্প ও আদর্শ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। কেন মেয়েমানুষে চিরদিন ধরিয়া পুরুষের দাসত্ব করিবে? ঐ যে দীপা জীবনের সকল দিক ছাড়িয়া দিয়া অহোরাত্র ঘর-সংসারের পিছনে খাটিয়া মরিতেছে, একদিন তাহার মোহ কমিয়া যাইবে। তখন সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া হয় ত অনুতাপ করিবে। ভগবান এই দুর্লভ জন্মটা দিয়াছেন নিশ্চয়ই কেবল রাঁধিবার ও হাঁড়িকুঁড়ি নাড়ানাড়ি করিবার জন্য নয়!

আবার সে জোর করিয়া বিক্ষিপ্ত মনকে পুস্তকের পাতায় আবদ্ধ করিল। ঝি আসিয়া ডাকিল, 'মা খেতে ডাকছেন।' রাত হইয়া গিয়াছে—মনে ছিল না, মা ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। আবার অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল। ঝি পুনরায় আসিয়া কহিল, 'দিদি, মায়ের শরীর আজ ভাল নেই। বললেন, বেশীক্ষণ ব'সতে পারবেন না, যদি আপনার দেরী থাকে তবে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে—শুতে যাবেন।'

'হ্যাঁ, মা উপরে যান না! আমার জন্যে অনর্থক রাত করছেন কেন? আমি খানিক পরে যাচ্ছি।'

আরও ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে খাইতে গেল তখন সবারই খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেছে। তাহার খাবার লোহার জাল দিয়া ঘেরা ঢাকনীর ভিতর ছিল। ঝি আসিয়া আসন পাতিয়া জল গড়াইয়া দিল। একা ঘরে বসিয়া আহার্য্যের থালা টানিয়া লইবার সময় হঠাৎ কাহার উপর যেন গভীর অভিমানে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া গেল। তুচ্ছ ব্যাপার—রাগ-অভিমানের কিছুই নাই। অন্যদিন সকলের সঙ্গে খায়, আজ হয় ত মায়ের শরীর ভাল নাই, তাই কাজ সারিয়া উপরে চলিয়া গেছেন; তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি আজিকার এই তুচ্ছ কারণটাই তাহার মনে আঘাত করিল এবং সংঘর্ষের বেদনা আনিয়া দিল। আপনার অজ্ঞাতসারেই দীপার ঘরের দৃশ্য মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িতে লাগিল বারংবার তাহার কল্যাণী মূর্ত্তি। সমস্ত কাজ নিজে করিয়া, নিজের হাতে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনের থালা স্বামীর সম্মুখে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিয়া এতক্ষণ সে হয় ত পাখা হাতে সুমুখে বসিয়াছে। আর তাহারই সহিত তুলনায় তাহার এই একাকী দাসী-চাকরের হেফাজতে খাওয়াটা আজ অন্ধকার মনে হইল! তাড়াতাড়ি

আহার সারিয়া সে উপরে চলিয়া গেল। সামনের টেবিলের উপর খোলা বইগুলা যেন তাহাকে উপহাস করিতেছে। সুইচ টিপিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া সে শুইয়া পড়িল। তখন সেই অন্ধকারে তাহার অভিমান ভাসাইয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। সুধীর আজ তাহাকে অনুরোধের অবকাশ মাত্র না দিয়া তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে ফিরিয়া হোষ্টেলে চলিয়া গেল। সবাই তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছে! কেন, নারীত্বের যে সৌরভ ও মাধুর্য্য, তাহার কোন আকর্ষণই কি তাহার নাই! শেষে অনেক রাত্রি অবধি যখন তাহার ঘুম আসিল না, তখন আলো জ্বালাইয়া একটা চিঠি লিখিতে বসিল সুধীরকে। মনের সঞ্চিত অনেক অনুযোগ, অনেক অভিমান তাহাতে বর্ষিত করিয়া শেষে লিখিল—

'আজ দীপাকে দেখে তুমি নিশ্চয় মনে মনে তার সঙ্গে আমার তুলনা করেছ। এবং সে তুলনায় তোমার চোখে আমি অনেক নীচে নেমে গেছি, কিন্তু ওটা তোমার বুঝবার ভুল। যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে জগতের সকল দুঃখ-দৈন্য বরণ করে নিতে আমিও প্রস্তুত। তোমার জন্যে আমি অনেক কিছু সইতে পারি এবং অনেক কিছু করতে পারি; কিন্তু তোমার জন্যে পারি নে এমন বস্তুও সংসারে আছে, সে হচ্ছে অন্যায় অপমান। তোমার জন্যেও অন্যায় অপমান আমি সইতে পারি নে। তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে পদে পদে তাই আমি পাচ্ছিলাম, সেই জন্যেই হয় ত তোমার মনে ব্যথা দিয়ে আমি চলে এসেছি! তুমি ত জান, বরাবরই আমি একটু স্বাধীন প্রকৃতির। উৎপীড়ন আমার সহ্য হয় না। কিন্তু তাই বলে তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আর আমি জানি—যা আমি করেছি, অন্যায় কিছু করি নাই।'

পরীক্ষা কাছে, সুধীর একটা মোটা বই খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কাল রাত্রিবেলাকার কথাগুলা মনে তোলপাড় করিতেছিল। সুমিত্রার কথার কোন জবাব না দিয়া তাহার অনুরোধের মর্য্যাদা না রাখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসা হয় ত অন্যায় হইয়া গেছে, কিন্তু তাহার মনের ভাব গোপন রাখিয়া লাভ কি? আজকাল প্রায়ই তাহার মনে হয়, সুমিত্রা বড় আত্মপরায়ণ। স্বাধীনতা, অন্যায়ের প্রতীকার, জীবনের উচ্চদিক, ইত্যাকার বড় বড় কথা তাহার মুখে লাগিয়া আছে, কিন্তু নারীর সেই চিরন্তনী সুধাপাত্র তার কই? বিবাহের পর হইতে সে আজ অবধি স্ত্রীর কোন কথার প্রতিবাদ করে নাই, বরঞ্চ তাহার মতেই চলিয়াছে। কিন্তু আজকাল স্পষ্টই বুঝিতে পারে, মোহের আবরণ ছিন্ন হইয়া আসিতেছে। সুমিত্রার অনেক আচরণকেই সমালোচনার চক্ষে দেখে আজকাল—দেখিতে চায় না, হঠাৎ চোখে পড়িয়া যায়! হৃদয়হীন নয় সে; মা, বোন, স্ত্রী সকলেরই স্নেহের কম্পন আলো ছায়ার লীলা সে আপন মনে অনুভব করে। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই একটা নিগূঢ় অশান্তি যেন তাহার জীবনকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দিয়াছে! সুমিত্রার প্রেম তাহাকে তাহার পূর্ব্ব-জীবনের সমস্ত ভিত্তিভূমি —সমস্তই স্নেহের উপকূল হইতে আঘাত করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইতে চায়! অস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে সে, এ যাত্রায় শান্তি নাই, সহিষ্ণুতা নাই, ক্ষমা নাই! কিন্তু তবু থামিতে পারে না, তরুণী পার্শ্বচারিণীর মোহময় চক্ষু-তারকার দিকে চাহিয়া উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলে।

সুমিত্রাকে যে উত্তরখানা লিখিল তাহাতে তাহার মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে লিখিল—

"সুমিত্রা, আজ অবধি তোমাকে অপর কোন নারীর সঙ্গে তুলনা করি নি। আমার কাছে তুমি চিরদিনই অনন্যা। তোমার সঙ্গে তোমার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে আমার মন একটি সুমিষ্ট-রসে ভরে উঠেছিল; নারী-প্রকৃতিকে তার স্বস্থানে দেখবার সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছিলাম। তোমাকে লুকোব না, আমারও মনে আশা ছিল, তোমাকে একদিন আমাদের সংসারের আনন্দিত শিখরদেশে দেখব। আমার মা যে ভার বহনে ক্লান্ত হয়েছেন, তোমার সুপটু সুন্দর নবীন হাতে তাই তুলে দেবেন। কিন্তু আমার সে আশা সফল হ'ল না! আমাদের বাড়ীর ভিতর তুমি প্রবেশ করতে পারলে না, যাওয়ামাত্র ওখানকার হাওয়ায় তোমার আঘাত লাগ্‌ল। তুমি যাকে অপমান মনে কর, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে চলে আসতে চাইলে, আমি কি তোমাকে সাহায্য না ক'রে থাকতে পারি? সত্য হোক, মিথ্যা হোক, যা তোমাকে পীড়ন করে, তার কাছ থেকে তোমাকে রক্ষা করতে আমি বাধ্য। তুমি বল, ওসব জটিলতার মধ্যে তুমি যেতে চাও না। আমাদের দু'জনের যখন আলাদা সংসার হবে, তখন তুমি সেই সংসারের কর্তৃত্ব ভার নেবে। আমি তোমাকে সমালোচনা করতে চাই নে, কিন্তু এ ব্যবস্থায় সর্ব্বতোভাবে শান্তি পাই নি। পুরানকে একেবারে অস্বীকার করে কি নূতন দাঁড়াবার ভিত্তি পায়? তুমি জীবন থেকে আর সবই ছেঁটে ফেলতে চাও, কেবল তোমার ও আমার সুখ এবং কামনা ছাড়া; কিন্তু আমাদের জীবনের কি কোন বৃন্ত নেই? আমাদের অতীত কি নেই? সবারই সঙ্গে যোগ না রেখে সকলকে অস্বীকার ক'রে কি আমরা কোন দিন সুখী হতে পারব? জানি না এসব লিখে তোমার মনে ব্যথা দিলাম কি না, কিন্তু আমার বা

ানে হয়, অকপটে তোমাকে লিখলাম। মনে ক'র না—আমি কোন অভিসন্ধি নিয়ে এসব লিখছি, বা তোমার মতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাতে চাই, আমার মনের কথা তোমাকে বললাম মাত্র।'

২৭

সুমিত্রার মা লোক মন্দ নহেন, কিন্তু বাঙালী-ঘরের সামাজিক ব্যবস্থা এমনই যে, বিবাহের পরই কন্যার প্রতি সকল কর্ত্তব্য সারা হইয়া গিয়াছে, মনে করা স্বাভাবিক। বিবাহের সময় আগে পর্য্যন্ত বাঙালী মা-বাপের মনে শান্তি থাকে না, চোখে ঘুম এবং আহারে রুচি থাকে না। এমন একটা গুরুতর দায়িত্বের ভার নিষ্পন্ন করিয়া তাঁহারা ভাবেন, একেবারে সকল কর্ত্তব্যের সমাধা হইল। ইহার পরে কেবল আরামের নিশ্বাস ফেলা এবং ভারমুক্ত হওয়া। তাই সুমিত্রা যখন বিবাহের পরও শ্বশুরবাড়ীতে থাকিল না—নূতনতর জটিল সমস্যা বহন করিয়া আনিয়া পিতৃগৃহে হাজির হইল, তখন স্নেহবশতঃ মুখে কিছুই না বলুন, ভিতরে ভিতরে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও আজ-কাল এ অসন্তোষ প্রায়ই নানা আকারে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

সেদিন সকালে সুমিত্রার ছোট ভাই নির্ম্মলের কয়েকজন বন্ধুকে নির্ম্মল তাহার জন্মতিথি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। মায়ের কাছে গিয়া বলিল, 'মা, তোমাকে কিন্তু সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। ছোটদির ঐ ঘরটায় একটা বড় টেবিলে একটা ফর্সা চাদর পাতিয়ে মালীকে বলব, কয়েকটা ফুলের তোড়া এনে দেবে। খাবার অবশ্য তোমাদের যা খুশী দিতে পার। লুচি, তরকারী, মিষ্টি, চা—কিন্তু তোমার আলমারীতে রাখা

সেই ডিনার সেটের কাচের প্লেটগুলা বার করে দিতে হবে। আমি চাই একটু ডিসেন্সি আর সুন্দর করে খাওয়ানো। ছোটদির ঘরের সামনেই ছাদ। বেশ হবে। কাচের প্লেটে খাবার সাজিয়ে টেবিলের উপর দিও। আমি নীচে বাবার লাইব্রেরী ঘর থেকে গোটাকতক চেয়ার আনিয়ে দিচ্ছি।'

বিরজা ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, 'এ কথা তোমার ছোটদিকে বল গে বাছা। ও কি তোমায় তার ঘর ছেড়ে দেবে? আমার এত বড় বুকের পাটা নেই যে, ও-কথা আমি তাকে বলব। দেখ বলে-কয়ে যদি রাজী করাতে পার।'

সুমিত্রা কি একটা কাজে এদিকে আসিতেছিল, মায়ের কথা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত আহত হইল। নির্মল তখন বলিতেছে, 'কেন, ছোটদি কি আর একদিনের জন্যে তার ঘর ছেড়ে দিতে পারবে না? সারাদিনই ত ঐ ঘরে মুখ গুঁজে বসে বই পড়ছে। একদিন না হয় তোমার ঘরেই পড়বে! ও-ঘরটা ছাড়া দোতালায় সুবিধামত ঘর আর কই? তোমার ঘরটায় ঘরজোড়া পালঙ্ক।'

সুমিত্রা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'এ তর্কে কাজ কি, আমি কি কোন দিন বলেছি যে-ঘরটায় আমি থাকি—সেটাতে আমারই মৌরসী পাট্টা? তোমাদের যখন যা দরকার লাগে ব্যবহার করলেই পার। আমি যতদিন এখানে আছি, রয়েছি মাত্র।'

বিরজা কহিলেন, 'অত তেজ করিস নে সুমিত্রা, মেয়েমানুষকে জীবনে ওতে ঠকতে হয়! বেশ ত ছোট ভায়ের জন্মদিনে আনন্দ করে যা চাচ্ছে, দে না—সব ক'রে কর্ম্মে দে। সংসারে স্নেহ, মায়া, মমতা, ভক্তি—এই গুলা শেখ।'

অভিমানে ও রাগে সুমিত্রার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে

মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নির্মল অপ্রতিভ হইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল, 'ছোটদি অল্পতেই বড় রেগে ওঠে। আমি ত এমন কিছু বলি নি—'

মায়ের কাছে চোখের জল গোপন করিতে সুমিত্রা হেঁট হইয়া টেবিলের উপর এটা ওটা নাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

২২

যতীন তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'দেখ ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠ্‌ছে। কি যে একটা তুচ্ছ ঝগড়া ক'রে বৌদি চলে গেলেন, আজ মাস ছয়েক হয়ে গেল, এখনও ফিরলেন না, মা মনে মনে খুবই কষ্ট পান, বাবার ভয়ে কিছু বলতে পারেন না।'

কাদম্বিনী কহিল, 'সে আমি জানি। বাবার কাছে বৌদির নাম করবার জো নেই। তা হলে রেগে আগুন হবেন। বলেন, সবারই কথা অগ্রাহ্য ক'রে নিজের জোরে এত সখ ক'রে বৌ আনলাম, সে বৌ মুখ রাখলে না। সুধীরের উপর কর্তব্য আমি করে যাব, যতদিন না সে রোজগার করে, মাসে মাসে টাকা পাঠাব, কিন্তু তাদের কথায় আর আমি নেই।'

যতীন কহিল, 'তবেই একটা শান্তির সংসারে ঘোর অশান্তি এসে গেল। যদি তুমি বল, তবে আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। একজন মক্কেলের কাছে একবার কলকাতায় যেতে হবে—'

কাদম্বিনী বিশেষ উৎসাহিত না হইয়া উত্তর দিল, 'তোমার চেষ্টায় আর কি হবে, ওসব গোলমেলে কথার মধ্যে যেতেই আমার ভয় করে।

তার চেয়ে দাদাকে একটা চিঠি লিখে দিই বাড়ী আসবার জন্যে, মা'র শরীর খুবই খারাপ। সেও ত কতকাল বাড়ী আসে নাই। দাদা যদি আসে আমি জিজ্ঞেস করব।'

যতীন বলিল, 'কি জিজ্ঞেস করবে?'

কাদম্বিনী উত্তর করিল, 'জিজ্ঞেস করব, আজও কি তার অভিমান ভাঙাতে পার নি? তবে আর তুমি কি পুরুষমানুষ!'

যতীন সহাস্যে কহিল, 'পুরুষমানুষ সম্বন্ধে তোমার সংজ্ঞা তা হলে কি রকম?'

কৃত্রিম কোপকটাক্ষে স্বামীর দিকে চাহিয়া সে কহিল, 'কেন, তা কি জান না? মেয়েমানুষের জীবনের যত অভিযোগই বল আর অনুযোগই বল, স্বামীকে ভালবাসলে সে আর কতক্ষণ? সূর্য্যের আলোয় যেমন বরফ গলে যায়, সেই রকম সমস্ত অভিমানই গলে জল হয়ে যাবে যদি—'

'যদি তোমার বৌদি দাদাকে যথেষ্ট ভালবাসে। বৌদির কথা আমি জানি নে, কিন্তু সুধীরের দিক থেকে ত দেখতে পাই ও-বস্তুর অভাব নেই। সুমিত্রার জন্যে ও না করেছে কি?'

'আহা সেইখানেই যে দাদা ভুল করেছে, যদি সে সুমিত্রার উপর রাগ করত বা তার ব্যবহারে দুঃখিত হ'ত তা হলে দেখতে বৌদি কোন্ দিন চলে এসেছে!'

যতীন অন্যমনস্ক হইয়া কহিল, 'সুধীরের মনে সত্যি কি দুঃখ হয় নি? স্ত্রীর সঙ্গে এক বাঁধনে-বাঁধা পড়বামাত্র তার এতদিনকার স্নেহ-নীড়ের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল, তুমি কি মনে কর পুরুষে এত অশান্তি পায় না?'

'পায় বই কি। আমার মনে হয় দাদা খুবই অশান্তির মাঝে আছে আর বৌদিও গলতে সুরু করেছে। কিন্তু আমি আজ দাদাকে একটা চিঠি লিখব একবার আসবার জন্যে—মায়ের শরীর খারাপ, যদিও মন

খারাপ, আরও বেশী, তার আসা দরকার। যথেষ্ট হয়েছে, আর ছেলেমানুষী কতদিন করবে।'

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, 'লিখবার আগে মা'কে একবার জিজ্ঞেস করবে নাকি ?'

'পাগল, মা'কে কি জিজ্ঞেস করে। তুমি বাইরে বাইরে থাক, হয় ত লক্ষ্য কর না, কিন্তু আমি দেখতে পাই, মা রোজ দাদার ঘরের জিনিসগুলি নিজের হাতে ঝেড়ে-মুছে রাখেন, দু'বেলা, ঐ ঘরখানি ধুইয়ে মুছিয়ে রাখেন। কেন তাঁর এত যত্ন, প্রত্যেকদিনই তিনি আশা করেন, হয় ত সে এসে পড়তে পারে। কত সময় দেখেছি কোন একটা কাজ করতে করতে বাইরে গাড়ীর শব্দ হ'লে চমকে উঠেছেন। কি যেন একটা আশা ক'রে মনে মনে উন্মুখ হয়ে থাকেন। আমার এখন এক এক সময় খুব কষ্ট হয়, হয় ত আমি যদি আরও একটু মানিয়ে গুছিয়ে চলতে পারতাম, যদি বৌদিকে আরও সহ্য করে চলতাম, তা হলে হয় ত সে চলে যেত না, দাদাও যেত না।'

যতীন বিস্মিত হইয়া স্ত্রীর পানে চাহিল। মৃদুস্বরে কহিল, 'আগে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন দেখছি সত্যিই ভালবাসার পক্ষে বিরহটা বড্ড দরকার। নইলে—'

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কাদম্বিনী হাসিয়া [illegible] কহিল, 'নইলে আমার মুখে এমন কথা! কিন্তু না, সত্যি এখন একটা জিনিস যেন আমি বুঝবার কিনারায় এসেছি, বাঙালীদের বৌকে কেউ গ্রাহ্য করে না, আমল দেয় না, কিন্তু একটি মেয়েমানুষের উপর সংসারের কতখানি নির্ভর ক'রে, কত কি সে বদলে দিতে পারে এ সত্যের একটুখানিও যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারত!'

যতীন বলিল, 'আমি কিন্তু খুব হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। তাই এখন

দেখি আজকালকার নানা মাসিকপত্রে দীর্ঘ উচ্ছ্বসিত প্রবন্ধ, মেয়েদের অধিকার কত সঙ্কুচিত, তাদের ক্ষমতা কত প্রতিহত—এই সব বড় বড় কথা নিয়ে, তখন আমার হাসি পায়। কাগজে কলমে বড় বড় কথা লিখলে মানায় ভাল, কিন্তু সত্যিকার জীবনে সেই সব কথাকে কেউ কি পরোখ করে দেখেছে? আমাদের দেশে বিয়ের সময় সেই যে একটা স্ত্রী-আচার প্রচলিত আছে,"বর বড়, না কনে বড়," তার মানে কি বল ত? সেটা নিছক স্ত্রী-আচার নয়, বুঝলে গো মহিলা? সত্যিকার জীবনে বরের চেয়ে কনে ঢের বড় হয়ে দাঁড়ায়।'

'যেমন আমি হয়েছি।' কাদম্বিনী হাসি চাপিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিল।

নীচে একজন মক্কেল জরুরী কাগজপত্র লইয়া আসায় যতীন প্রস্থান করিল। কাদম্বিনী কাগজ কলম যোগাড় করিয়া দাদাকে পত্র লিখিতে বসিল। সুধীরকে যে চিঠিখানা লিখিল সংক্ষেপে তাহা এই: মায়ের শরীর খুব খারাপ, এখানে চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত হইতেছে না, একবার কলিকাতায় লইয়া যাওয়া দরকার। সে শীঘ্র একবার বাড়ী আসিয়া যেন এসবের ব্যবস্থা করে। চিঠিখানা খামে মুড়িয়া বন্ধ করিয়া তাহার আর একখানা পত্র আর একজনকে লিখিবার ইচ্ছা হইল—সুমিত্রাকে। সুমিত্রা হয় ত তাহার চিঠি হাতে পাইয়া মনে করিবে, আবার এই শুভাকাঙ্ক্ষী মেয়েটি তাহাকে কি রীতি-নীতি শিখাইতে আসিয়াছে। মনে মনে হয় ত হাসিবে। কিন্তু তথাপি খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া লিখিল—

'ভাই বৌদি, তুমি হয় ত আমার চিঠি পেয়ে অবাক হবে কিন্তু তুমি আমাদের একান্ত আপনজন। নিজের লোকের কাছে আর লজ্জা বা সঙ্কোচের কি কারণ রয়েছে। তুমি কতদিন চলে গেছ, আজ অবধি

একটিবার খোঁজ নিলে না। একটা তুচ্ছ অভিমানকে খুব বড় ক'রে রেখে সবারই সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক মুছে ফেলতে চাইলেই কি মুছে ফেলা যায়। তুমি কবে আসবে, পত্রোত্তরে লিখে জানিও। তোমার ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস সাগ্রহে তোমার অপেক্ষা করে রয়েছে। তোমার পড়বার ছোট টেবিলটি, তোমার ড্রেসিং টেবিল, তোমার বাক্সো, তোমার বিছানা মা রোজ দু'বেলা ঝাড়িয়ে মুছিয়ে রাখেন। তুমি যখন এখান থেকে চলে যাও, মাথার কতকগুলি কাঁটা, চুল বাঁধবার ফিতে তোমার আয়না-দেওয়া টেবিলের উপর ফেলে রেখে গিয়েছিলে, সেই কয়েকটিও মা তোমার ঘর গুছিয়ে রাখবার সময় রোজ পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখেন। বুঝতে পারি নে, এত স্নেহ এত সম্মান ছেড়ে তুমি চলে গেলে কেন? আমাদের কোন ব্যবহারে যদি কষ্ট পেয়ে থাক, আমাদের তা বুঝিয়ে দিলে না কেন? অভিমানটাই তোমার বেশী হ'ল। শুনছি আবার কলেজে ভর্ত্তি হয়েছ, খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করছ, কিন্তু তুমি যদি কলেজের নাম কাটিয়ে দিয়ে চলে এস, আর কোন মেয়ে ভর্ত্তি হবে, সে ফাঁক তখনই ভরে উঠবে, কিন্তু তুমি চলে যাওয়ায় আমাদের বাড়ীতে যে বিরাট শূন্যতা, তা ত আর কিছু দিয়েই পূর্ণ হবে না। আশা করি উত্তর একটা পাব।'

২৩

সুমিত্রার বড়দিদি এলাহাবাদ হইতে পত্র দিয়াছেন, তিনি বুধবার রাত্রির ট্রেনে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। হাওড়া ষ্টেশনে যেন লোক থাকে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে তিনি বাপের বাড়ীতে আসিতেছেন এবং আসিয়া বেশ কিছুদিন থাকিবেন। তাহার কারণ, বড়মেয়ে প্রতিমার জন্ম পাত্র অন্বেষণ। এই সুদূর বিদেশে ঐ কাজটি ভাল করিয়া হইবার

আশা নাই! সুমিত্রার বড়দিদি উর্ম্মিলা বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়, ঘরণী গৃহিণী। স্বামী এলাহাবাদের একজন সুবিখ্যাত উকীল। বাপের বাড়ীতে বড় একটা যাওয়া-আসা নাই। সুমিত্রার বিবাহের সময় ছোটছেলের কঠিন অসুখ ছিল বলিয়া আসিতে পারেন নাই। অনেকদিন পরে মেয়ে বাপের বাড়ীতে আসিতেছে, ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। মা একপ্রস্থ বিছানা নূতন করিয়া তৈয়ারী করাইলেন, বড় একটা নেটের মশারির অভাব, যেগুলা বাড়ীতে আছে সবগুলাই ছোট, দু'জন বা একজন শুইবার উপযুক্ত। দর্জ্জিকে ডাকাইয়া একটা বড় মশারির অর্ডার দেওয়া হইল। সুমিত্রা বলিল, 'বড়দি কি আর বিছানা সঙ্গে না নিয়েই আসছে যে মা তুমি এত ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ!'

মা বলিলেন, 'যাট, বিছানার তার অভাব কি মা! বাপের বাড়ীতে আসছে তার সঙ্গের বিছানা খুলে তবে তাকে পেতে দেব, তা কি হয়! চিরদিনই ত একা ঘরের একা গিন্নী, সংসারের ঝক্কি বার মাস পোয়াচ্ছে। দু'দিন বাপের বাড়ীতে জুড়াতে আসছে। এসেই হাতের কাছে সব পাবে।'

কিন্তু আসল অভাব ঘরের। দোতালার সবচেয়ে বড় ঘরটায় সুমিত্রা থাকে। এবারে সে আগে হইতেই বলিল, 'মা, বড়দির জন্যে আমার ঘরটা ছেড়ে দি! আমি রাত্রিতে দক্ষিণ দিকের ঐ ছোট ঘরটায় শোব। আর পড়াশোনার জন্যে বাবার লাইব্রেরী ঘরটা আছে। সে ঘরটা খুব নির্জ্জন, লোকজন বড় কেউ যায় আসে না।'

মা বলিলেন, 'দেখ, তোর কোন অসুবিধা হবে না ত? দক্ষিণের ঘরটায় আমি একটা পালঙ্ক আনিয়ে দিই। কুমুদাকে বলে দিই, ঘরটা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিক।'

মঙ্গলবার দিন বিকালে কোথায় বেড়াইতে যাইবে বলিয়া গাড়ী বাহির

করিয়া বলিয়া সুমিত্রা শুনিল, গাড়ী লইয়া নির্ম্মল মার্কেটে গিয়াছে, ফল-মূল বিস্কুট চকোলেট আরও কি সব অতি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিতে। মা বলিলেন, 'নির্ম্মল যেতে চাইছিল না, জোর ক'রে পাঠালাম। কাল সব উর্ম্মিলার ছেলেপিলেরা আসবে। বাজার থেকে কিনে কেটে আনিয়ে না রাখলে হয় ত তাদের কষ্ট হবে।'

সুমিত্রা ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল, তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে; সেই রাঙা আভার দিকে চাহিয়া তাহার হৃদয় বিগলিত হইতে সুরু করিল। দিদি কতদিন পর আসিতেছে, অনেক দিন দীর্ঘ অদর্শনের পর প্রিয়তমা দুহিতা তাহার আপন সংসারের কর্ত্তব্যভার ক্ষণকালের জন্য অপরের হাতে গচ্ছিত রাখিয়া পিতৃগৃহে আসিতেছে। এ আবার কি ঐশ্বর্য্যময় মধুর রূপ। অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেছে। দিদিকে ত সে হিংসা করিতেছে না, বরঞ্চ কতদিন পর তাহার সঙ্গে দেখা হইবে বলিয়া মনটা উৎফুল্ল। কিন্তু তবু—তবু কেন মনে একটা তুলনার ভাব আসে। পাশাপাশি দু'টি ছবি ভাসিয়া ওঠে। মনে হয় দিদির সঙ্গে তাহার যেন অনেকটা তফাৎ হইয়া গিয়াছে। ছিঃ, এসব কি নীচ চিন্তা তাহার মনে! কি তাহার মনে হইল—বারান্দা হইতে নিজের ঘরে গিয়া বাক্স খুলিয়া কাদম্বিনীর চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। এই চিঠিখানা সোনা কাদম্বিনী তাহাকে লিখিয়াছিল। চিঠিখানা যখন প্রথম পায় তখন একবারমাত্র পড়িয়া একটুখানি অনুকম্পার হাসি হাসিয়া রাখিয়াছিল। মনে মনে বলিয়াছিল, 'এ কেবল আমাকে ওখানে নিয়ে যাবার ফন্দী। একবার গেলে তখন আবার সুরু হবে সেই নুরুক্কিয়ানা চাল, সেই সব কুসংস্কার আর শাসন মেনে চলা। না, ওদের সঙ্গে আমার শিক্ষা-দীক্ষা চাল-চলন—যখন সবই আলাদা, যতই সেন্টিমেন্ট করা যাক, কখনই মিলবে না।'

আজ কিন্তু সেই অনাদৃত চিঠিখানাই আর একবার বাহির করিয়া পড়িতে কেন যেন তাহার ইচ্ছা হইল। কেন যেন চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত একটি নিভৃত শয়নকক্ষ। পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যা বিস্তৃত। পড়িবার ছোট টেবিলটির উপর নীলাভ টেবিল-ল্যাম্প জ্বলিতেছে, একপাশে কয়েকখানা ডাক্তারী কেতাব, কয়েকটা লাল নীল পেন্সিলের চিহ্ন দেওয়া সুধীরের নোটবুক, আর এক-পাশে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' 'সোনার তরী' 'চোখের বালি'। ড্রেসিং টেবিলের উপর তাহার মাথার ফিতা কাঁটা পড়িয়া আছে।—এ ঘরের যে রাণী হইতে পারিত সে ঘর শূন্য করিয়া চলিয়া গেছে। তাই ঘরের প্রতিটি জিনিস প্রতীক্ষাপরায়ণ। বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, চাকরে তাহার ঘর হইতে তাহার বাক্সে জিনিসপত্র, হিষ্ট্রি, বোটানি এবং সিভিক্সের মোটা মোটা বইগুলা দক্ষিণের ছোট ঘরটায় লইয়া চলিয়াছে। বড়দি কাল রাত্রির ট্রেনে পৌঁছাইবেন, কিন্তু মা আজই ঘরখানা গুছাইয়া তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে চান। আজ চাকর দ্বারা বাহিত ঐ মোটা মোটা বইগুলির দিকে তাকাইয়া সুমিত্রার ঠিক অবিমিশ্র প্রীতির উদয় হইল না। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ গোধূলি তখন মিলাইয়া গিয়া আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে! কিশোরীর প্রথম প্রেমের মত অনন্ত আকাশ মৌন, প্রতীক্ষমান, স্পন্দিত। সুমিত্রা মনের ভিতর খুব একটা শূন্যতা অনুভব করিল। বি-এ পরীক্ষায় সে যেন স্কলারশিপ পাইয়াছে, ইচ্ছা করিলে স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা রাখে—নারীর স্বাধীন অগ্রগতি, মেয়েদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, প্রভৃতি অত্যন্ত উচ্চদরের কথা ও কল্পনা তাহার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে থাকিলেও মনের সেই শূন্যতার ভাব ঘুচিল না। তখন টেবিলে বসিয়া চেয়ারটা টানিয়া লইয়া সুধীরকে একটা চিঠি লিখিতে বসিল। আজ কিম্বা কাল একবার

[illegible] জন্তও অনুরোধ করিল। বেয়ারার হাতে চিঠিটা পাঠাইয়া দিয়া সে যখন উদ্বেলিত হৃদয়ে চিঠির উত্তরের পরিবর্তে নীচে সুধীরের গলার আওয়াজ শুনিবার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল, তখন বেয়ারা আসিয়া খবর দিল 'বাবু কলকাত্তামে নহি।' তাহার বন্ধুরা সংবাদ দিয়াছে সুধীরের মায়ের পীড়ার সংবাদে সে হঠাৎ আজ বিকালের ট্রেনে বাড়ী চলিয়া গেছে।

২৪

পরের দিন রাত্রিবেলায় বড়দিদি আসিলেন। সঙ্গে তিন ছেলে এক মেয়ে, দাসী, জিনিসপত্র। সঙ্গে আসিয়াছে, দূর সম্পর্কের একজন দেবর। মা অনুযোগ করিয়া কহিলেন, 'এতদিন পরে এলি, জামাই সঙ্গে এলেন না কেন? তবু একবার দেখা হ'ত।'

'ওঁর আসবার যো কি!' উর্মিলা পাখার তলায় বসিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'উনি যদি সঙ্গে আসবেন, তা হলেই আমার আসা হয়েছিল আর কি! সেই সকাল থেকে রাত্রির বারটা পর্যন্ত কাজ—মক্কেল আর কাগজপত্র। বাঃ এ যে সুমিত্রা, কি সুন্দর হয়েছিস দেখতে। আমি যখন শেষ এখানে আসি, তখন তুই স্কুলে বোধ হয় থার্ডক্লাসে পড়িস, বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেতিস। বিয়ে হয়েছে কতদিন হ'ল। আর ভগ্নীপতি কই? কি নাম তার, সুধীর?'

'নেই? বাঃ, কবে গেল? আসবে শীগগির নিশ্চয়। তা হলেই আমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি এখন মাস-দুয়েক অন্ততঃ আছি। শ্বশুরবাড়ী কেমন লাগছে? খুব মন বসেছে ত! না, এখন কলকাতার উপর টানটা বেশী হবে, কর্তাটি যে এখন এখানেই পড়েন কি না।'

অনেকদিন পর বাড়ীতে সন্তা-সন্ততি যেন একটা উৎসবস্রোত

বহিতেছে। নির্ম্মল বড়দির ছেলেমেয়েকে লইয়া গ্রামোফোন বাজাইতেছে। তার ছোট ভাই টুকু নিজের এয়ারগান ও ট্রাই-সাইকেলের বাহাদুরি বড়দিকে দেখাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। মা চা ও জলখাবারের বহু বিস্তৃত আয়োজন লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

অবশেষে প্রকাণ্ড একটা ট্রেতে চা ও নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী নিজের হাতে বহিয়া আনিয়া মা ঘরে ঢুকিলেন।

উর্ম্মিলা বলিল, 'বাবাঃ, এত খেলে রাত্রিতে আবার খাবে কে?'

মা বলিলেন, 'কেন তোদের পশ্চিমের ক্ষিদের কি এই নমুনা?'

উর্ম্মিলার বড়মেয়ে প্রতিমা অত্যন্ত ধীর শান্ত ও অতিশয় সুশ্রী। তাহার মায়ের চেয়ে দেখিতে সে আরও ভাল। পায়ে আলতা পরা, কপালে সিঁদুরের টিপ, এই মাত্র স্নানের ঘর হইতে ট্রেনের কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া একটি ধোয়ান মিলের শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। সে নম্রকণ্ঠে কহিল, 'আমি ত চা খাই নে দিদিমণি।' বলিয়া খাবারের একটি প্লেট সঙ্কুচিত হস্তে তুলিয়া লইয়া লইল।

সুমিত্রার মা তাহার দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, 'মেয়েটিকে তোর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় উর্ম্মিলা। কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কথা। কেমন ধীর-শান্ত ধরণ। কিন্তু তুমি একালের মেয়ে হয়ে চা খাও না দিদিমণি, আশ্চর্য্য ত।'

মেয়ের হইয়া উর্ম্মিলা জবাব দিল, 'না, ছোট থেকে ও অভ্যাস আমি হতে দিই নাই। বিয়ের আগে চা খাওয়া অভ্যাস করবে, কি জানি যেখানে শ্বশুড় বাড়ী হবে সেখানে চা খাওয়ার রেওয়াজ যদি না থাকে—, অনর্থক কষ্ট পাবে।'

সুমিত্রা প্রতিবাদের কণ্ঠে কহিল, 'এ কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি দিদি। আজকাল কোন্ বাড়ীতে আর চা খাওয়ার ঘটা নেই? কিন্তু

এ[illegible] ছেড়ে দিলেও মেয়েমানুষের পক্ষে ওরকম হেলার সামগ্রী হয়ে থাকাটাই অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। কবে কোন্‌কালে তার বিয়ে হবে, আর সে শ্বশুর বাড়ী যাবে এই কথাটি মনে রেখে তাকে ছোট থেকে 'এটা করতে নেই' 'ওটা খেতে নেই'—এমনি হাজার অনুশাসনে বাঁধবার কি দরকার? আমার কাছে এটা খুবই অন্যায় বলে মনে হয়।'

ঊর্ম্মিলা বলিল, 'কি জানি ভাই তোর ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা কেমন, আমার ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছিল, তোর মত স্বাধীন চিন্তা করবার বা এত লেখাপড়া শেখবার কোনটারই অবকাশ ঘটে নি ভাই। তাই হয় ত অনেক অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। আমার মনে হয়, লেখাপড়া শেখার দু'টো দিক আছে, একটা হচ্ছে মানুষকে কেবলমাত্র মানুষ হবার সুযোগ দেওয়া, তাকে জ্ঞানে-চিন্তায় উদারতায় বড় করা। এখানে মেয়ে পুরুষের শিক্ষা একই রকম। কারণ তারা দু'জনেই মানুষ। কিন্তু আর একটা ব্যবহারিক দিকও ত আছে শিক্ষার। যে শিক্ষার ফলে পুরুষকে ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, আইনবিদ, ব্যবসায়ী করে—যাতে সে জীবিকার উপায় করতে পারে, দুই চোখ খোলা রেখে প্রবঞ্চিত না হয়ে অর্থ উপার্জ্জনের ন্যায়-পথ অবলম্বন করতে পারে। ঠিক তেমনই ব্যবহারিক শিক্ষা মেয়েদের একটা আছে, সেটা হচ্ছে বিয়ের পরে কেমন করে শান্তি এবং সহযোগের ভিতর দিয়ে যথেষ্ট সুন্দর করে ঘর-সংসার চালাবে। কেবল ঘরের কাজ শিখিয়ে গৃহকর্ম্মে নিপুণ করলেই, আর কয়েকটা গান একটু সেলাই একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দিলেই মেয়ের মায়ের নিষ্কৃতি নেই রে ভাই। তাকে অহর্নিশ ছোটটি থেকে শেখাতে হয়—বিয়ের পর যে সংসারে যাবে সেখানে কত ভিন্ন রুচির কত রকম সংস্কারের মানুষ আছে, নিজের মতামত না খাটিয়ে পাঁচজন পাঁচমতের মানুষ নিয়েও কেমন করে সুন্দর সংসার চালান যায়।'

সুমিত্রা কহিল, 'আজকাল তোমার ওসব মতামত একেবারে অচল বড়দি। আজকাল ছেলেরা সবাই বড় হয়ে উপার্জ্জনক্ষম হয়ে বিয়ে করছে। বিয়ে করে নিজের জন্যে। বিয়ের পর স্ত্রীকে দিয়ে শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীর পিস্‌শাশুড়ী মন যোগাবার জন্যে নয়।'

উর্ম্মিলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'জানি রে তা জানি। কিন্তু তোরা যে ঐখানেই মস্ত ভুল করিস, কেবল শাশুড়ী আর দিদিশাশুড়ী দলের লোকদের মন জোগানোর জন্যই পরমত-সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, নীরবতা—এইগুলি মেয়েদের শেখা দরকার? একটা খুব আপ্‌ টুডেট একা সংসারের নমুনা নিয়ে দেখ্‌ না, সেখানে কি মায়ের সঙ্গে বড় বড় সব ছেলেমেয়েদের, না পুত্রবধূর, না বাড়ীর কর্ত্তার হুবহু মেলে? মতভেদ ঘটলেই যদি মনান্তর হওয়ার মত ধৈর্য্যহীন রুক্ষ শিক্ষা সেই বাড়ীর গিন্নীর হ'ত, তা হলে কি শান্তিটা বজায় থাকত?'

তাদের মা এতক্ষণে রান্নাঘরের তদারকে ব্যস্ত ছিলেন, এখন আসিয়া কহিলেন, 'চল চল সব খেতে চল। ট্রেনে কি সামান্য হয়রানি গেছে! আজকের মত সকাল সকাল খেয়ে বিছানায় চল। কাল থেকে যত খুসী গল্প হবে, কেউ বারণ করবে না।'

২৫

রাত্রিবেলায় বড়দিদি কিছুতেই ছাড়িলেন না। সুমিত্রাকে টানিয়া আনিয়া নিজের পাশে শোয়াইয়া কহিলেন, 'আমার কাছে থাক্‌ না আজ রাত্রির মত। গল্প করে নিই। আবার হয় ত কতদিন পরে দেখা হবে তার ঠিক কি।'

সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, 'এত তাড়া কিসের, তুমি না শুনলাম হু'মাস থাকবে?'

'তুইও যে অতদিন থাকবি তার ত কিছু ঠিক নেই। আমাকে একটা দরকারে থাকতে হবে।' সুমিত্রা মনে মনে হাসিল। বড়দিদি তাহা হইলে কিছুই জানেন না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে তাহার একটা লজ্জা-মিশ্রিত শঙ্কার মত হইল, যদি বড়দিদি সব জানিতে পারেন। মনের একটা দিক সগর্বে কহিল, জানিতে পারিলেই বা। তাঁহার সহিত সবদিকেই যে আমার মতের মিল থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আমি নিজে যাহা অন্যায় মনে করি না, পৃথিবীশুদ্ধ তাহাকে অন্যায় বলিলেও কিছু যায় আসে না।

কিন্তু মনের আর একটা দিক সঙ্গোপনে নিঃশব্দ লজ্জায় শীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। সুমিত্রা মৃদুস্বরে কহিল, 'বড়দি, বিয়ে হলেই কি বাপের বাড়ী ভুলে যেতে হয়, তুমি কতদিন পর এসেছ, ইচ্ছে করলে কি মাঝে মাঝে আসতে পারতে না ?'

ঊর্মিলা হাসিলেন—'ইচ্ছে করলে কি আসা হয় রে পাগলি। এবারে যে সেই বৈশাখ মাস থেকে তোড়জোড় করছি আসবার জন্যে। কিছুদিন আগে ওঁর সঙ্গে এই আসা নিয়ে একবার কথা কাটাকাটি হ'ল। উনি বললেন, 'মেয়ের বিয়ের পাত্র কি এখানে থেকে খোঁজা হয় না, এ শুধু তোমার বাপের বাড়ী যাবার ছল। আসলে আমাকে শুধু দুঃখ দেওয়া। জান না কি তুমি চলে গেলে এ বাড়ীতে একটি দিনও চলে না।' আমিও জবাবে দু'কথা বললাম। কিন্তু ওদের সঙ্গে কথায় কে পারবে বল, শেষে চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জলও পড়ল। রাত্তিরে উনি বললেন, 'আমার দোষ নিও না, স্বয়ং সতীকেও বাপের বাড়ী যাবার জন্যে কাঁদতে হয়েছিল।'

বড়দিদি ও তাঁহার ছেলেমেয়েরা পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল, সহজেই ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সেই সুপ্ত রাত্রিতে বিনিদ্র শয্যায় শুইয়া সুমিত্রার মন যেন আর এক রাজ্যে যাইয়া উপনীত হইল। সেখানকার সঙ্গে তাহার কখনও

পরিচয় হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে কত বই, কত প্রবন্ধ, কত কি পড়িয়াছে আজকালকার যুগের সব চেয়ে চলতি কথা নারী সমস্যা লইয়া কত তর্ক বিতর্ক করিয়াছে, কিন্তু ইহার গহন-গভীর মধুর-রূপটি কখনও চোখে পড়ে নাই। অথচ আজ বড়দিদির মুখের টুকরা টুকরা দুই চারিটি কথায় সেই অজানা তটের অস্ফুট কলোচ্ছ্বাস কেমন করিয়া যেন সমস্ত মনকে ভরিয়া তুলিল। কত কি যে মনে আসিতে লাগিল, দীপার কথা—তাহার সেই ছোট্ট গৃহস্থালির ছবি—বড়দিদির সেই না-দেখা ঘরকন্নাও যেন মনের উপর নিরন্তর ভাসিতে লাগিল। যেখানে তাঁহাকে না হইলে এক দণ্ডও চলে না এবং একজনের একটা দিনও কাটিতে চায় না। আর বড়দিদির স্বামীর সেই কথাটা কানে বাজিতেছিল—আমার দোষ নিও না। বাপের বাড়ী আসবার জন্যে স্বয়ং সতীকেও কাঁদতে হয়েছিল।

২৬

পরের দিন সুধীরের একটি চিঠি পাইল। সে লিখিয়াছে, মাকে লইয়া শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। তাঁহার চিকিৎসার খুবই দরকার, এবং সে চিকিৎসা এখানে হইবে না। একটা ছোট-খাট বাড়ী খুঁজিবার জন্য আত্মীয় স্বজনকে লিখিয়াছে। তা ছাড়া কাদম্বিনীর জন্যও মা কলিকাতায় আসিতে চান, আর এক মাস পর তাহার ছেলে হইবে। বড় বয়সের প্রথম ছেলে। কলিকাতায় থাকিলে মনে অনেকটা ভরসা থাকে। এই সকল প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়া শেষে সে লিখিয়াছে, 'কাল রাত্রিবেলায় আমাদের ঘরে (না আমাদের ঘর নয়, ও বললে ভুল বলা হয়, তোমার ঘর, কারণ যদিও তুমি চলে গেছ, তবু এখন সমস্ত ঘরখানি

তোমার জিনিসে ও তোমার চিহ্নে কণ্টকিত হয়ে রয়েছে), শুয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল তুমি যেন নীচে কাজ করছ, কাজকর্ম সেরে এখনই আসবে। আর একটু দেরী হয় ত আছে। এমন কথা কিছুতে মনে হচ্ছিল না যে, তুমি এখানে নেই আর আসবেও না। মানুষের জীবনে যেটা স্বপ্ন সেটাই তার আসল জীবন। নইলে আর জীবনের মানে থাকত কি?'

সুধীরের চিঠিখানা সে পড়িয়া নিজে কি ভাবিল তাহা বলা যায় না, সে কথা হয় ত তাহার অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু সেখানা সে অত্যন্ত গোপনে বাক্সের তলায় লুকাইয়া রাখিল। পাছে বড়দিদি দেখিতে পান বা খুঁজিয়া-পাতিয়া পড়িয়া ফেলেন। এখন সে একান্ত স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিতে লাগিল—লজ্জা, লজ্জা, তাহার চারিদিকে দুস্তর লজ্জা! শ্বশুর-বাড়ী ভাল লাগে নাই, সেখানে আইডিয়াল মেলে নাই, স্বতন্ত্র ব্যক্তি-সত্তা আপন বিকাশের পথ খুঁজিয়া পায় নাই—এসব প্রকাণ্ড কথার চারিপাশে লজ্জার কালিমা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

ঊর্ম্মিলার অবশ্য তেমন স্বভাব নয়। সুমিত্রা যে দশটা বাজিতে না বাজিতে কলেজে চলিয়া যায়—সংসারের কাজকর্ম সমস্ত হইতে সরিয়া আসিয়া সারাদিন বই লইয়া পড়িতে থাকে, এটা তাহার চোখে বাড়াবাড়ি ঠেকিয়াছিল। কিন্তু কখনও এ লইয়া অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করে নাই। একদিন শুধু কথায় কথায় মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'সুধীর বুঝি খুব পড়া-শোনা ভালবাসে?'

মা শঙ্কিত হইয়া তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, 'হাঁ, আজকালকার ছেলেদের ধরণ জানিস ত। জেদ ধরেছে—এত যদি পড়া-শোনা করেছে তা হলে বি-এ টাও পাশ করুক না।'

সেদিন রবিবার, কলেজের উপসর্গ ছিল না। সকালবেলায় সুমিত্র বলিল, 'চল বড়দি, আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়িয়ে আসবে।'

উর্ম্মিলা রাজী হইল। গাড়ী আসিতে বলিয়া সে কাপড় ছাড়ি[illegible] গেল। উর্ম্মিলাকে লইয়া সুমিত্রা দীপাদের বাড়ীতে গেল। আজকা[illegible] সময় পাইলেই সে দীপাদের বাড়ীতে আসে। এদিকে উর্ম্মিলার আসিবা[illegible] গোলমালে অনেক দিন আসা হয় নাই। দীপা তখন ভিতরের দিকে[illegible] বারান্দায় ষ্টোভ ধরাইয়া কি করিতেছিল। অগ্রসর হইয়া আসিয়া সুমিত্রাকে দেখিয়া কহিল, 'তুই এসেছিস! আমি ভাবছিলাম তো[illegible] ওখানে খবর নেব; কতদিন এদিকে আসিস নাই। এদিকে ভাই উনি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছেন, কাল কলেজ থেকে জলে ভিজে এসে জ্বর হয়েছে—'

উর্ম্মিলা পিছনে একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাকে এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই, দেখিয়া দীপা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া থামিয়া গেল।

'আমি সুমিত্রার দিদি হই।' উর্ম্মিলা স্নেহহাস্যে কহিলেন

আলাপ হইয়া গেল—ষ্টোভ ধরাইয়া দীপা তাহার স্বামীর জন্য হর্লিক্স তৈয়ারী করিতেছিল, নিজের হাতে চা করিয়া আনিয়া খাওয়াইল অতিথিদের। তারপর তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে একটা পাত্রে বেদানার রস তৈয়ারী করিতে লাগিল।

উর্ম্মিলা উঠিয়া পড়িয়া কহিলেন, 'আজ ভাই তোমাকে বেশীক্ষণ আটকাব না। এখনও হয় ত কত কাজ তোমার বাকী আছে, তা ছাড়া তার চেয়েও বড় কথা একজন একলাটী চুপচাপ শুয়ে আছেন।'

দীপার সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল—সে উঠিয়া তাঁহাদের বিদায় দিতে সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির দুয়ার অবধি আসিল। মোটরে উঠিয়া সুমিত্রার মনে হইল, 'বা, বেশ ত, আজ যে দীপার বেশীক্ষণ আমাদের কাছে বসে থাকতে ভাল লাগবে না, সেটা বড়দি না বলে না শুধিয়ে কেমন চট করে ধরে ফেললে, অথচ ও আমার এত বন্ধু—আমার ও কথা মনেই হয় নি।'

বড়দিদি আসিতে আসিতে বলিলেন, 'ঐ ত ঐ মেয়েটি দাসীর মত সংসারের চরকিতে অবিশ্রান্ত খাটছে; কিন্তু ওর মনের আনন্দে সমস্ত আকাশ রাঙা।'

সুমিত্রা আর কিছু বলিল না। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাইয়া তাহার মনেও সজল অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, কথা বলিতে ভাল লাগিতেছিল না।

নীচের তলায় সুধীরের গলার আওয়াজ পাইয়া সুমিত্রা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল। একটা সেলাই লইয়া বড়দিদির মেয়ে প্রতিমাকে সেলাই শিখাইতেছিল, সূঁচটা আঙুলে ফুটিয়া গেল। চোখে মুখে এমন একটা ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, আত্মসম্বরণ করা দুরূহ। প্রতিমাকে কহিল, 'যাও ত মা, আমার জন্যে এক গ্লাস জল নিয়ে এস।'

উর্ম্মিলা ছোট ভগ্নীপতিকে খুব আদর-যত্ন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন, 'মা কেমন আছেন? তাঁর চিকিৎসার কি হ'ল?'

সুধীর কহিল, 'মা'কে যে এখানেই এনেছি। এবারে বেশ বিধিবদ্ধ-ভাবে এখানে কিছুদিন রেখে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করাব। যদি বাঁচতেই হয়—ভাল করে বাঁচা দরকার। অমন চির-রুগ্ন হয়ে থাকা বড়

কষ্ট। আমরা যে নম্বরে উঠেছি, আপনাদের এখান থেকে একটু দূর হবে।'

ঊর্মিলা সায় দিয়া কহিলেন, 'সে ঠিক কথা, ওঁকে আরও আগে আনা উচিত ছিল কলকাতায়।'

তারপরে সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হইবার পালা। সুমিত্রা সুধীরের গায়ের শার্টটা খুলিয়া আলনায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া বলিল, 'ইঃ, গরমে যে একেবারে ঘেমে উঠেছ!' পাখা চালাইয়া দিয়া কহিল, 'তোমার জন্যে এক গ্লাস সরবৎ আনব?'

সুধীর আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল, কোন একটা ভুলিয়া যাওয়া গানের সুরের মত অর্দ্ধস্ফুট রেশ সুমিত্রার দৃষ্টিতে সবটা মনে নাই, কিন্তু অল্প অল্প ঝঙ্কার মনে পড়িতেছে, তাহারই আবেশ এবং স্মৃতিতে অন্যমনস্ক।

তাহার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া সুধীর কহিল, 'না সরবৎ আনতে যেতে হবে না। ওটা না পেলে কিছুই এসে যায় না, কিন্তু অনেক দিন পরে তোমাকে দেখছি, এখনই চলে গেলে সে ক্ষতি সইবে না।'

সুমিত্রা আস্তে আস্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, 'আমাকে দেখতে পাওয়া এমনই কি দায় তোমার, মেয়েমানুষকে অমন করে বাড়াতে নেই। দু'মিনিট সবুর কর, সরবৎ নিয়ে আসতে আমার বেশীক্ষণ লাগবে না।'

সুধীর বলিল, 'তোমার মুখে এমন কথা কখনও শুনি নাই সুমিত্রা! আমার বরঞ্চ মনে হ'ত মেয়েমানুষকে যথোপযুক্তরূপে বাড়াবার ক্ষমতাই আমাদের নেই। আজ একেবারে নতুন কথা তোমার মুখে।'

'হ্যাঁ, এবার থেকে আমার মুখে নতুন কথাই শুনতে পাবে।' এই বলিয়া সুমিত্রা সরবৎ আনিতে গেল।

কাচের গ্লাসটা স্বামীর হাতে দিয়া মৃদুস্বরে অপরাধীর মত জিজ্ঞাসা করিল, 'মা কেমন আছেন ?'

'বিশেষ ভাল নেই। তাঁর বাতের ব্যথা রয়েছে জানতেই, এখন আবার হার্টের দুর্ব্বলতা হয়েছে।' সুধীরের গলার স্বর হইতে ক্ষণপূর্ব্বের আনন্দ-চপলতা চলিয়া গিয়াছে। ভারাক্রান্ত স্বর।

সরবৎটা নিঃশেষে পান করিয়া গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, 'মাকে দেখতে যেও, আমি ওবেলায় এসে নিয়ে যাব, যদি বল।' তারপর একটু থামিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, 'এখন তাঁর শরীর ভাল নেই, দেহের অবস্থা খারাপ। আমি যেমন করে সমস্ত অভিমান দূরে ঠেলে দিয়েছি, তুমিও তাই দাও। কারণ এখন অভিমানের সময় নয়।'

সুমিত্রার মনেও অনেক কথা ভীড় করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কিছু বলিবার আগেই ঊর্ম্মিলা একখানি রেকাবীতে সুধীরের জলখাবার লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। ছোট একটি টিপয় সুধীরের চেয়ারের কাছে সরাইয়া আনিয়া তাহার উপর রেকাবিখানি রাখিয়া মিষ্ট হাস্যে কহিলেন, 'একটু মিষ্টিমুখ কর ভাই। দিদির সঙ্গে নতুন আলাপ যেন এমনই মিষ্ট হয়।'

সুধীর একটা সন্দেশ মুখে দিয়া কহিল, 'সে দিদি আপনার গুণেই হবে। মিষ্টান্ন দিয়ে উৎকোচ দিতে হবে না। আপনার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের দেখা, তবু মনে হচ্ছে আপনি যেন সত্যি আমার নিজের দিদি। কতদিন দেখি নি। কতদিন পর বিদেশ থেকে এসেছেন।'

ঊর্ম্মিলা বলিলেন, 'নিজের দিদি না ত কি। আমার কাছে সুমিত্রাও যেমন তুমিও তেমনই। কোন তফাৎ নেই। আচ্ছা তোমার মায়ের যখন এত অসুখ, সুমিত্রাকে নিয়ে যাবে নিশ্চয়। এই সময়েই ত বৌয়ের সেবার দরকার। তার উপর শুনচি, তোমার বোনটিরও

এই শীঘ্র ছেলে হবে। তা হলে তোমাদের বাড়ীতে এখন সেবা যত্ন করবার কোন লোকই নেই বল। তুমি যেয়ে অনেকটা সাহায্য করতে পারবে।'

সুধীর খাইতে খাইতে একবার চকিতের দৃষ্টিপাতে সুমিত্রার মুখের ভাব দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সুমিত্রা নতমুখে ছিল বলিয়া তাহার কপোলের উপরকার স্বল্প ঘোমটার একাংশ এবং চিবুকের একটুখানি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার সমস্ত মন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তবে কি সুমিত্রা তাহার দিদির কাছে যাইবার কথা বলিয়াছে। নিজে বলিতে লজ্জা করে বলিয়া দিদিকে দিয়া কথা উত্থাপন করাইয়াছে? যখন সুধীর হঠাৎ মায়ের অত্যন্ত অসুস্থ সংবাদ পাইয়া বাড়ী গিয়াছে তখন হইতে তাহার ব্যাকুল মন অহর্নিশি এই কামনা করিয়াছে যে, তাহার একান্ত পীড়িত দুর্ব্বল মাতার শয্যাপার্শ্বে সুমিত্রাকে স্নেহময়ী সেবাপরায়ণা রূপে দেখিতে পায়। এ কামনা যে তাহার কত অতলস্পর্শী সুমিত্রার দিদির মুখে এই কয়েকটি কথা শোনা মাত্র তাহা যেমন করিয়া বুঝিতে পারিল আগে তাহা পারে নাই। কিন্তু তাহার এ আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। সুমিত্রা তেমনি নতমুখেই অস্ফুটস্বরে বলিল, 'তা কি করে হবে বড়দি। আমার যে পরীক্ষা আসচে। মা'কে দেখতে যাব। কিন্তু ওখানে থাকতে পারব না। এটা পরীক্ষার বছর। তা হলে ভারি ক্ষতি হবে।'

সুধীরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। খাবারের থালাটা কোন ক্রমে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'তাই ভাল। একেবারে না গেলে সেটা ভারি দৃষ্টিকটু হবে। ওবেলা তুমি মা'কে একবার দেখতে যেও। কলেজ ফেরত আমি বরঞ্চ এসে নিয়ে যাব।'

উর্ম্মিলা তাঁহার স্নেহময় তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে

পারিয়াছিলেন আগেই। কিন্তু অভিমানিনী সুমিত্রা পাছে কিছু মনে করে বলিয়া কখনো কিছু বলেন নাই। সুধীরের অল্পক্ষণ পূর্ব্বেকার উল্লসিত উচ্ছ্বাস এবং এখনকার এই বিবর্ণ মুখ দেখিয়া আরও অনেক কিছুই বুঝিতে পারিলেন। মৃদু স্বরে বলিলেন, 'সুমিত্রা, তুই কি বলছিস বুঝতে পারছিস নে। পরীক্ষা দেওয়া হোক বা নাই হোক তাতে কি যায় আসে? যাঁকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসিস তাঁর মা'র অসুখে প্রাণ ভরে সেবা করবি নে? এ আফশোষ হয় ত আর কখনো মন থেকে মুছবে না। ভাই, তোরা আমাকে অশিক্ষিত মনে করিস বা সেকেলে মনে করিস—যাই মনে করিস এই কথা আমি তোকে হাজারবার বলব। এই উপদেশই আমি তোকে হাজারবার দেব। মনে করে দেখ তুই যখন সুধীরের জীবনে আসিস নি, তখনও তাঁর স্নেহের মাধুর্য্যে ওর জীবন ভরে ছিল। তুই যখন ওর জীবনে প্রবেশও করিস নি, তখনও যে বাড়ীতে তার শতস্মৃতিময় দিনরাত্রি কেটেছে, সে বাড়ী যে কেন তোর কাছে প্রিয় হতেও প্রিয়তর হ'লো না, যাঁদের স্নেহে ভালবাসায় ও বড় হয়েছে তাঁদের প্রতি কেন তোর ভালবাসা শতধা হয়ে ফুটে উঠ্‌ল না, এ আমি আজও বুঝতে পারি নে। আর বুঝতে পারি নে বলেই বড় কষ্ট হয় মনে। তোর জন্যেই কষ্ট হয়। মেয়েমানুষের জীবনে এ না হওয়া যে কত বড় কষ্ট তা আমি খুব ভাল করে জানি।'

সুমিত্রা কিছুতেই মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। তাহার চোখ দিয়া নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে কি বলিবে? এ ত বড়দিদির ভর্ৎসনা নয়। তিনি নিজের জীবনে যাহা পাইয়াছেন যাহা অনুভব করিয়াছেন সুমিত্রার জীবনে তাহারই অভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ভূমিকম্পে যেমন করিয়া প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যশিখরের ভিত্তিও টলিতে থাকে, তেমনই করিয়া সুমিত্রার আত্মপরায়ণ স্বাধীন ব্যক্তি,

লজ্জাও টলিতে লাগিল। বড়দিদির ব্যথিত বিস্মিত দৃষ্টিপাতের সম্মুখে সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না।

সুধীরেরও মনের ভিতরটা দুলিতেছিল। বিবাহের পর হইতেই তাহার নবযৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা সুমিত্রাকে কেন্দ্র করিয়া যে সামঞ্জস্য ও প্রীতিপূর্ণ সংসার খুঁজিতেছিল, আজ পর্য্যন্ত সেখানে সে কেবলই ঘা খাইয়াছে। স্ত্রীকে সে কোন প্রকারেই মনঃক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই কিন্তু স্ত্রীকে বাদ দিয়াও আরও যে সকল গভীর স্নেহবন্ধন জীবন মূলের গভীরে স্থান লইয়াছিল তাহাদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেও কম কষ্ট হয় নাই। বড়দিদির স্নেহমধুর অথচ মর্ম্মান্তিক এ[illegible] কয়েকটি কথা শুনিয়া তাহার এই কয়েক মাসের সমস্ত মনঃক্ষোভ একী[illegible] হইয়া তাহার কণ্ঠকে বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সহজভাবে [illegible] বলিতে পারিবে না বলিয়া সহসা সে কিছুই বলিল না। চোখ নামাই[illegible]পনাকে সংবরণ করিয়া লইতে লাগিল। তাহার পর কোন এক [illegible] সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে, অ[illegible]াসি।' বলিয়াই বাহির হইয়া গেল। কোনরূপ প্রত্যুত্তরের জ[illegible] মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহার ভয় হইতেছিল, দিদি[illegible]র্ভেদী দৃষ্টির সামনে তাহার মনোব্যথার অনেকখানিই হয় ত সে প্র[illegible] করিয়া ফেলিবে। তাই আর কোন কথা বলিবার বা শুনিবার [illegible]কাশ না দিয়াই সে একরকম দ্রুতপদে পলাইয়া গেল। ঠিক এমনই সময়ে সুমিত্রার মা বিরজাসুন্দরী ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, 'সুধীর চলে গেল। তার মায়ের এতবড় অসুখে সব ভারই ত তার উপর। বেশীক্ষণ বসবার তার সময় কোথা। সুমিত্রাকে ওবেলা একবার পাঠিয়ে দিতে বলে গেছে আমাকে। কলেজ ফেরত সে নিতে আসবে।'

সুমিত্রা আপনাকে কষ্টে সংবরণ করিয়া মুখ তুলিল।

মায়ের কাছে নিজেকে শক্ত করিয়া সোজা হইয়া মুখ তুলিল সে। উর্ম্মিলা বলিলেন, 'ওমা, ওর শাশুড়ীর এমন অসুখ, ওকে ত যেতেই হবে। বরঞ্চ আরও ঢের আগেই যাওয়া উচিত ছিল। বাড়ীর বৌ, সে কি আবার বলবার কইবার অপেক্ষা রাখে না কি? সুধীর এসে একবার বললে তবেই সেজেগুজে খবর নিয়ে আসবে, নইলে নয়!'

বিরজা সায় দিয়া বলিলেন, 'তা সত্যি। তবে ওবেলায় যদি দেখি আমিও কাল সকালে একবার সময় করে যাব।'

উর্ম্মিলাও ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় সুমিত্রার দিকে একবার সহাস্যমুখে চাহিয়া গেলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুমিত্রার সমস্ত মন আর্দ্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যেটুকু বাকী আছে সে কেবল সঙ্কোচের আবরণ। কোন স্নেহময় হস্ত যদি সেই আবরণটুকু ছিন্ন করিতে সাহায্য করে তবে তাহার হৃদয়ের পক্ষে যাহা সহজ তাহা এক নিমেষেই সম্ভব হইয়া উঠিবে।

সারাদিন অসহ্য গুমট গিয়াছে। বিকাল হইতে না হইতে মেঘে সমস্ত আকাশ ঘিরিয়া আসিল। সুমিত্রা দুপুর হইতে ছটফট করিয়া ফিরিতেছে। রাস্তায় একটা গাড়ীর শব্দ হয় আর তাহার মনে হয় ঐ নিশ্চয় সুধীরের গাড়ীর শব্দ। জানালা দিয়া তাড়াতাড়ি মুখ বাড়াইয়া দেখে—না গাড়ী ত তাহাদের গেটে দাঁড়াইল না। রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। এমনই করিয়া ছটফট করিয়া ঘড়ি দেখিয়া তিনটার সময় সে বেয়ারাকে বলিল, 'যা সত্যবাবুকে বলে আয় গাড়ী আনবেন।'

সত্যবাবু তাহাদের অনেক কালের পুরানো ড্রাইভার।

মা সেখান দিয়া যাইতেছিলেন, সুমিত্রা কৈফিয়তের সুরে বলিল, 'যদিও মোটে তিনটে বাজছে কিন্তু আকাশে যা মেঘ জমেছে বৃষ্টি এলো বলে। তাই গাড়ীটা আমি বার করতে বললুম। বৃষ্টি এসে পড়বার আগেই যাই দেখা করে আসি গে।'

আকাশের ঘনঘটার দিকে চাহিয়া মা শঙ্কিতমুখে বলিলেন, 'এই মেঘ মাথায় করে যাবি? না হয় বৃষ্টি থামলে সন্ধ্যের পরেই যেতিস? কই সুধীরও ত এখন আসে নাই।'

সুমিত্রার কণ্ঠস্বর শুনিয়া উর্ম্মিলা বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'মায়ের সবেতেই ভয়। মেঘ আবার কোথা? এই ত কাছে, কলকাতা সহরে মোটরে করে এক-আধ মাইল যেতে আর কত সময় লাগবে? সুতাবাবুকে আগেই আমি বলে দিয়েছি গাড়ী আনতে। নির্ম্মল আর বিমু সঙ্গে যাক। সুধীর কখন আসবে বলে ও ব'সে থাকবে, এত কুটুম্বিতা করতে হবে না?'

সুমিত্রা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শাদাসিধা লাল পাড়ের একখানি শাড়ি পরিয়া একেবারে তৈয়ারী হইয়া আসিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় দিদি পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'দেখ বড়দি, কিছুক্ষণ পরে যেন গাড়ী পাঠাতে ভুলে যেও না। তোমাদের সকলেরই আবার সন্ধ্যের পর গাড়ীর দরকার থাকে। বাবার ক্লাব যাওয়া আছে, বিমুর জিমন্যাষ্টিকের আখড়া আছে, প্রতিমার সঙ্গীত সঙ্ঘে যাওয়া আছে। ওরই মধ্যে সময় করে আমাকে আনতে পাঠিও। ভুলো না যেন। নইলে ভারি মুস্কিল হবে।'

উর্ম্মিলা হাসিয়া বলিলেন, 'আমার বড় ভোলা মন। কি জানি ভাই, হয় ত ভুলেই বা যাব। কিন্তু, সত্যি করে বল ত সুমি, ভুলে গেলেই কি তুই বেশী খুসী হবি নে?'

সুমিত্রা ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'খুসী হ'ব! তার মানে?'

উর্ম্মিলা বলিলেন, 'কি জানি ভাই তার মানে, আমি ত তোর মত লজিক পড়ি নাই। তবে সংসারে সব জিনিসেরই মানে যে ঠিক লজিকের রাস্তা ধরে চলে না এটুকু বেশ বুঝেচি।'

সত্যবাবু এবাড়ীর অনেক দিনের পুরানো ড্রাইভার। উর্ম্মিলাকে অবধি এতটুকু দেখিয়াছেন। তিনি আড়ালে একটু হাসিয়া লইয়া বলিলেন, 'এইবার ষ্টার্ট দিই দিদি। আর দেরী করা চলবে না। দেখতে দেখতে খুব জোরে জল আসবে। তখন মোটরের পর্দ্দা ফেলা থাকলেও ছাট আটকাবে না। আর অত ভাবচ কেন ছোটদি, বড়দি দূরে গেলেও কলকাতা সহরে গাড়ীর অভাব কি?'

অভাব নাই সে সুমিত্রাও জানে। কিন্তু কিসের যে অভাব সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে যতই মোটর অগ্রসর হইতে লাগিল ততই তাহার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহারই পাশে বসিয়া নির্ম্মল আর বিনু ফুটবল-টিম্ এবং প্লেয়ারদের কথা লইয়া কত কি যে বকিয়া যাইতে লাগিল তাহার এক বর্ণও তাহার মাথায় ঢুকিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই খুব জোরে জল আসিল। বিনয় এবং নির্ম্মলকে সাবধানে বসিতে বলিয়া সে পর্দ্দা তুলিয়া বর্ষণ সিক্ত আকাশ এবং পৃথিবীর দিকে চাহিল। বৃষ্টির ধারায় তাহার মাথার চুল তাহার জামা কাপড় সমস্তই যে ভিজিতে লাগিল তাহাতে দৃক্‌পাতও করিল না।

ঐ ধারাসিক্ত প্রকৃতির মত তাহার মনের সমস্ত রুদ্ধ আবেগ সমস্ত দর্প অহঙ্কার স্নেহাতুর কামনা আপনাকে নিঃশেষে বর্ষণ করিয়া দিয়া লঘু হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে আকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর পর্দ্দাটা ফেলিয়া এদিকে ফিরিয়া নির্ম্মল ও বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'ওরে, তোরা যেন আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে

আসিস নে। আগে শুকনো তোয়ালেতে করে গা মাথা বেশ করে মুছবি। জামাটা না হয় ছেড়ে ফেলবি। এক পেয়ালা খুব গরম চা খেয়ে, জল থেমে গেলে তবে আসবি।' সে এমন ভঙ্গীতে আদেশ করিল এবং এমন সুরে কথা বলিল যেন যেখানে যাইতেছে সেখানে চিরদিন ধরিয়াই কর্ত্রীত্ব করিয়া আসিতেছে। মাঝখানে কয়েক ঘণ্টা বাইরে বেড়াইতে গিয়াছিল আবার ফিরিয়া যাইতেছে।

বিজু অনুকম্পার সুরে বলিল, 'এই সামান্য জলে আমাদের কি হয় ছোট মাসীমা, আমরা যে পুরুষমানুষ!'

নির্মল সায় দিয়া কহিল, 'নিশ্চয়! আমরা ত মোটরে চড়ে আরামে যাচ্ছি। সামান্য এক আধটু ছাট লেগেছে। আর ফুটবল প্লেয়ারদের কথা ভাব, যারা এই বৃষ্টি মাথায় করে খেলছে। ছোটদি অবশ্য মেয়ে-মানুষ—'

সত্যবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, 'ওদের যদি আপত্তি থাকে চা নাই খেলে, আমাকে কিন্তু একটু চা দিও ছোটদি। ঠাণ্ডাটা খুব লাগল।'

সুমিত্রা সহানুভূতির স্বরে কহিল, 'বড়দির জন্যেই লাগল সত্যবাবু। এ সমস্তই তার অতিব্যস্ততার ফল। মেঘ জল দেখেও সে ঠেলে পাঠালে।'

সত্যবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'তোমারও বোধ হয় একটু ব্যস্ত ভাব ছিল ছোটদি। আমার মনে আছে সকাল থেকে তুমি বোধ হয় আট-দশ বার আমাকে বলেছিলে, 'দেখবেন সত্যবাবু, তিনটের সময় থেকে হাজির থাকবেন, আর কোথাও যাবেন না যেন।' '

সুমিত্রা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'ও, আমার কোথাও যাবার কথা থাকলে অমনই হয়। খালি মনে হয় ঐ বুঝি সময় হয়ে এল, দেরী হয়ে যাচ্ছে বুঝি।'

সত্যবাবু আর কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে হাসিলেন। সুধীরদের নূতন

বাসার সামনে আসিয়া গাড়ী থামিল। আর একখানা মোটর সেই সময়েই বিপরীত দিক হইতে আসিয়া গেটের সামনে দাঁড়াইল। সুধীর নামিল তাহা হইতে। নামিবার সময় দুইজনের চোখাচোখি হইল। মনে হইল যেন সুধীরের চোখে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

কহিল, 'কলেজ থেকে ফিরছিলুম, জোরে জল এল। কিছু কিছু ভিজেছি। ভেবেছিলুম বাড়ীতে কাপড় ছেড়ে এই ট্যাক্সিতেই তোমাকে আনতে যাব। কিন্তু দেখছি, আমি যাবার আগেই তুমি এসেছ।' সুধীর ট্যাক্সিটা ছাড়িয়া দিয়া দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই গৃহে ঢুকিল। বাহিরের ঘরে সুধীরের পিতা ব্রজবাবু বসিয়াছিলেন। সুমিত্রা শঙ্কিত-চিত্তে তাঁহার পায়ের তলায় গড় হইয়া প্রণাম করিল। ব্রজবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সুধীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'এই প্রবল বৃষ্টিতে জলে ভিজিয়ে কেন নিয়ে এলে? আর দু'মিনিট সবুর করতে পারলে না?'

সুধীর লজ্জিতস্বরে কহিল, 'আজ্ঞে আমি কিছু জানি নে। আমি ত এইমাত্র ভাড়াগাড়ীতে কলেজ থেকে ফিরলুম। ভাইদের সঙ্গে নিজে এসেছে।'

সত্যবাবু ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, 'জামাইবাবুকে আপনি মিথ্যে দোষ দিচ্ছেন। ছোটদি নিজেই সবুর মানলেন না।'

ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমিত্রার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিতে গিয়া বলিলেন, 'এ কি মা, তোমার মাথা চুল যে সমস্ত ভিজে গেছে। যাও, যাও—সুধীর, বৌমণিকে উপরে নিয়ে যেয়ে কাদুকে বল তোয়ালে দিয়ে মুছে দেবে আর শুকনো কাপড় বার করে দেবে।'

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সুধীর বলিল, 'দেখ, আমিও ত ভিজে এসেছি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন খুব জোরে জলটা এল—সঙ্গে আবার একটা ছাতাও নেই; হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডাকলাম

—কিন্তু আমার চেয়ে তোমার উপর টান দেখছি বাবার অনেক বেশী। আমার কথা একবারও বললেন না, অথচ তোমার জন্যে কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এক মিনিটও আর তর সয় না।'

সুমিত্রা চাপা গলায় কহিল, 'নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন তোমাকে ভিজে কাপড় ছাড়াবার জন্যে আর একজন ওঁর চেয়েও ব্যস্ত হবে, সে কি তাগাদা দেবে না? তাই বাহুল্য বোধে ওটা আর বললেন না।'

সুধীর চোখের কোণে অপাঙ্গে সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, 'তাই নাকি? সে শুভাকাঙ্ক্ষিণীকে তা হলে তিনি এক নিমেষেই চিনে নিয়েছেন। ওঁর দৃষ্টি এখনও ঝাপ্সা হয় নি দেখছি, যদিও বয়স হয়েছে। অথচ কি মজা জান, বাবা নিজেই কিছুদিন আগে মস্ত করে হুকুম জারি করেছিলেন, তাঁর বৌমা এখানে আসতে পাবে না। তুমি এলে তবু উনি রাগতে পারলেন না বরঞ্চ ভীষণ খুশী হয়ে উঠলেন। তুমি কি যাদু জানো সুমিত্রা?'

সুমিত্রা ধরা গলায় বলিল, 'দেখ, অত তামাসা ক'র না। এটা ত আমি এবারে খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছি, আমার যা কিছু—সম্মানই বল আর আদরই বল সে তোমারই জন্যে। সেই যে বৈষ্ণব কবিদের একটি গানে আছে, 'তোমারই গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমার রূপে।' সেই জন্যেই আমি যত দোষই করে থাকি, মা বাবা আমার উপর কিছুতেই রাগ করে থাকতে পারলেন না। কারণ তুমি যে আমাকে ভালবাস।

সুধীর কোন কথা বলিতে পারিল না। যে কথা বলিতে চাহিল তাহা সিঁড়িতে উঠিবার মুখে বলা যায় না। ততক্ষণে তাহারা সিঁড়ির মুখে পৌঁছিয়াছে। কাদম্বিনী সহাস্যমুখে তথায় দাঁড়াইয়াছিল।

হাসিয়া বলিল, 'আমি সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছি। বাবাঃ, এই ক'টি সিঁড়ি উঠতে এতটা সময় লাগালে। গল্প তোমাদের কিছুতেই

ফুরোয় না। দাদার সঙ্গে দিবারাত্রি গল্প ত হচ্ছেই—এদিকে আমি এই যে কতদিন থেকে আশা করে আছি কবে তোমায় দেখব—না ভাই, আমার স্বভাবেরই দোষ। দেখ না, দেখা হওয়ামাত্রই আবার ননদিনী-গিরি ফলাতে সুরু করেছি। কি করলে আমার সংশোধন হয় বলে দিতে পার ভাই বৌদি?'

সুমিত্রা মধুর কণ্ঠে কহিল, 'সংশোধন নাই বা হ'ল ভাই। কিন্তু উপস্থিত তোমার দাদাকে একটি শুকনো কাপড় বার করে দাও আর মায়ের ঘরটা কোন দিকে আমাকে দেখিয়ে দাও। হাঁ, আর দেখ, আমার ভাই আর একটি দিদির ছেলে ভিজে এসেছে। চাকরকে দিয়ে একটা তোয়ালে আর ক'পেয়ালা চা নীচে পাঠিয়ে দিও। চায়ে একটু আদা দিও। ঠাণ্ডার পর লাগবে ভাল।'

কাদম্বিনী বলিল, 'দেখলে দাদা, এ বাড়ীর রাণী এসেই হুকুম দিতে সুরু করেছেন। সত্যি ভাই, এতদিন তোমার মত করে কেউ হুকুম করে নি বলে বাড়ীটা নিঝুম হয়েছিল।'

২৯

ঘণ্টাখানেক অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু শ্রাবণ রাত্রির আকাশ স্নিগ্ধ কালো মেঘে ঢাকিয়া আছে। শাশুড়ির ঘরে সুমিত্রা দাঁড়াইয়া তাঁহার শিয়রের দিককার টেবিলটার উপর ওষুধের শিশিগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল। মনোরমা বধূর সহিত এতক্ষণ অনেক গল্প করিয়াছেন, তাঁহার অসুখের কথা, কোন্ ডাক্তার দেখিতেছে, চিকিৎসা কেমন ভাবে হইবে। সুমিত্রার বড়দিদির গল্প, এমন অনেক কথাই হইয়াছে কিন্তু আসল কথা তিনি বরাবরই চাপিয়া

গেছেন। ইচ্ছা করিয়াই সে প্রসঙ্গের আভাসমাত্র এড়াইয়া গেছেন। কাদম্বিনী যেন ইচ্ছা করিয়া সে ঘরে আর কাহাকেও যাইতে দেয় নাই। তাহার মনের একান্ত অভিলাষ নির্জ্জন অবসরে সুমিত্রা সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া মায়ের কাছে বধূর চিরন্তন আসন অনায়াসে দাবী করিয়া লইবে। মনোরমা একটু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, 'বৌমা! সুধীর একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসে তোমাকে পৌছে দিয়ে আসুক। কই এখন ত তোমাদের বাড়ীর গাড়ী এসে পৌছায় নাই। আর রাত করলে তোমার মা হয় ত চিন্তা করবেন।'

সুমিত্রা কোন উত্তর দিতে পারিল না। মুখ নামাইয়া আঁচলের প্রান্ত খুঁটিতে লাগিল। বুঝিতে পারিল বড়দিদি ইচ্ছা করিয়াই গাড়ী পাঠান নাই। তাহাকে ক্ষমা চাহিবার, তাহার পরমতম ভুল শুধরাইয়া লইবার অবসর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সময় বহিয়া যাইতে লাগিল, এই দুর্লভ অবসরকে সে কিছুতেই সফল সার্থক করিয়া তুলিতে পারিল না। কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, মা, আমি যাইব না। আপনার কাছে থাকিলেও যে আমার জন্য চিন্তা করিবার আছে এমন অবিশ্বাস্য কথা আপনি কেমন করিয়া বলেন! ঠিক এই কথাগুলি তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে আসিলেও মুখে সে বলিতে পারিল না।

মনোরমা বধূকে নীরব থাকিতে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, 'ক[illegible] ত রাত বাড়তে লাগলো, তোমাকে পাঠাবার একটা ব্যবস্থা [illegible]ত হয় দেখছি।'

তাঁহার স্নেহই সুমিত্রার উপর ছিল সকলের চেয়ে বেশী। তাই অভিমানও বুঝি গভীর। অসুখ হইয়াছে, ভদ্রতার খাতিরে বধূ দেখিতে আসিয়াছে এইমাত্র। ইহার চেয়ে আর অধিক কিছু নয়। তাঁহার কথায় ও আচরণে এই ভাবটাই প্রকাশ করিতে চাহেন। নন্দাকে দিয়া

তনি যতীনকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, 'সুধীর বুঝি ডাক্তারের বাড়ী গেছে। বাবা যতীন, একটা গাড়ী নিয়ে এস, বৌমার রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'আজ্ঞে।' বলিয়া যতীন সে ঘর হইতে কোনক্রমে পালাইয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া কাদম্বিনীকে কহিল, 'এস তোমাতে আমাতে এক হান বিন্তি খেলি।'

'বিন্তি খেলবে! তুমি না বল বিন্তিখেলা মেয়েমানুষদের। ওতে বুদ্ধির চালনা হয় না কেবল—'

যতীন বলিল, 'আমি কি বলেছি তা যে তুমি সব সময় মুখস্থ করে রাখ এ খবর ত আমি জানতেম না। যাই হোক, তাসটা পাড় না দেখি। তোমাকে হারাতে হারাতে আবার জোরে জল এসে পড়বে। বৌদিরও যাওয়া হবে না আমি গাড়ী না ডেকে আনলে।'

'কেন বৌদি যেতে চাচ্ছেন নাকি?'

'না, তিনি হাঁ-ও বলছেন না, না-ও বলছেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তোমার মা আমাকে ডেকে বললেন, ওঁর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে।'

'বেশ করেছ পালিয়ে এসেছ। এই নাও তাস! আজ খুব মন দিয়ে খেলব। হয় ত সমস্ত রাত খেলেও হারাতে পারবে না।'

এমন সময় দরজায় একটা মোটরের ঘন ঘন হর্ণ শোনা যাইতে লাগিল। সিঁড়ি দিয়া পুরানো বেহারা হরিচরণ উপরে আসিতেছিল, কাদম্বিনী তাহাকে ডাকিয়া তীব্রস্বরে প্রশ্ন করিল, 'কাদের মোটর?'

সে থতমত খাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে দাদাবাবু এইমাত্র ডাক্তারের বাড়ী থেকে ফিরে এসেই আমাকে গাড়ী ডাকতে বললেন। বৌদি ফিরে যাবেন।'

কাদম্বিনী হাতের তাসগুলা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া হতাশ হইয়া কহিল, 'কি

আর বলব, দাদাও যেমন মা'ও ঠিক তেমনই। এত ভালবাসে তবু তার চেয়েও বেশী অভিমান। যেখানে সবচেয়ে জোর খাটে সেখানেও একটু জোর করবে না বলে পণ করেছে।'

যতীন বলিল, 'কারণ ওঁরা জানেন, শুধু জোর করলেই পাওয়া যায় না। গায়ের জোরের চেয়ে অভিমানের জোর ঢের বেশী। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার বৌদির যাওয়া হবে না—আচ্ছা দাঁড়াও আমি দেখে আসি।'

* * *

মোটরের অধীর হর্ণ ঘন ঘন বাজিতেছে। সামনে বর্ষার দুর্যোগময়ী রাত্রি। তাহার ব্যস্ততার অবধি নাই। সুমিত্রা যন্ত্র-চ[illegible]তের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে হইতে লাগিল, যাহা করিতে আসি[illegible] তাহার কিছুই হয় নাই। বাড়ীতে গেলে বড়দিদি অবাক হইয়া তাক[illegible]ন। কিন্তু সে যাহা বলিতে চায় তাহার সকল লজ্জা ভাসাইয়া সে কথা [illegible]না হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিতে কি পারে না? মাথার নিকট [illegible]ত সরিয়া মনোরমাকে প্রণাম করিবার জন্য সে তাঁহার পায়ের ক[illegible] আসিয়া দাঁড়াইল। মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম সারিয়া উঠিব[illegible]ময় হঠাৎ রুদ্ধস্বরে সে কহিল, 'আমি যাব না, আমি যেতে চাই নে[illegible] কোথা যাব আমি, আপনার কাছে আমি থাকব মা। আপনি কেন আমাকে চলে যেতে বলছেন?'

মনোরমা তাহার দু'টি হাত ধরিয়া ফেলিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, 'ও মা, আমার নামে এমন অপবাদ! ও সুধীর, ঐ মোটরখানা যে হর্ণ বাজিয়ে বাজিয়ে মাথা ধরিয়ে ফেললে বাছা। ওটাকে বিদায় কর।' বালিশের তলা হইতে একটা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে বলিলেন, 'তাই বলে শুধু হাতে বিদায় করিস নে। এই ঝড় জলের

রাত্রিতে শুধু শুধু গাড়ী আটক করে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে ওরা যেন গালাগালি না দেয়। এই নোটখানা ড্রাইভারকে দিন।'

সুধীর এক লম্ফে তিনটা সিঁড়ি টপকাইয়া নীচে নামিয়া গেল। মোটরের হর্ণ আর লেশমাত্র শোনা গেল না। এবং বিন্দুমাত্র বকাবকি না করিয়া শূন্য গাড়ী নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

যতীন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'নাও এইবার মন দিয়ে খেল। ফাঁড়া যা ছিল কেটে গেছে। মোটরটা বিদায় হয়েছে কিন্তু তোমার বৌদি রয়ে গেছেন।'

সমাপ্ত

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা